সে আসে ধীরে

হুমায়ূন আহমেদ

। হিমু সমগ্র ।

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. আক্কেলগুড়ুম - একটি প্রচলিত বাগধারা.......... 2
২. টিনের চালের একতলা বাড়ি................. 20
৩. মিসেস আসমা হক পিএইচডি 38
৪. মাজেদা খালা দরজা খুলে 53
৫. ইমরুলের সাজসজ্জা...................... 67
৬. হাবিবুর রহমান সাহেবের ব্রেইন 81
৭. বিস্ময়কর ঘটনা শেষপর্যন্ত ঘটেছে............ 108
৮. ফরিদার চিঠি......................... 117
৯. আমি সূর্যাস্ত দেখছি...................... 124

১. আক্কেলগুড়ুম – একটি প্রচলিত বাগধারা

উৎসর্গ

মৃত্যুর কাছাকাছি যাবার মতো ঘটনা আমার জীবনে কয়েকবারই ঘটেছে। একবারের কথা বলি। আমায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে–আমাকে নেয়া হয়েছে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। আমি চলে গিয়েছি প্রবল ঘোরের মধ্যে, চারপাশের পৃথিবী হয়েছে অস্পষ্ট। এর মধ্যেও মনে হচ্ছে হলুদ পাঞ্জাবি পরা এক যুবক আমার পাশে বসে। কে সে? হিমু না-কি? আমি বললাম, কে? যুবক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, হুমায়ূন ভাই, আমি স্বাধীন। আপনার শরীর এখন কেমন। শরীর কেমন জবাব দিতে পারলাম না, আবারো অচেতন হয়ে পড়লাম। এক সময় জ্ঞান ফিরল। হলুদ পাঞ্জাবি পর যুবক তখনো পাশে বাসা। আমি বললাম, কে? যুবক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি স্বাধীন।

হিমুর এই বইটি স্বাধীনের জন্যে। যে মমতা সে আমার জন্যে দেখিয়েছে সেই মমতা তার জীবনে বহুগুণে ফিরে আসুক–তার প্রতি এই আমার শুভকামনা।

হুমায়ূন আহমেদ]

০১.

আক্কেলগুড়ুম নামে বাংলা ভাষায় একটি প্রচলিত বাগধারা আছে। যা দেখে গুড়ুম শব্দে আক্কেল খুবড়ি খেয়ে পড়ে–তাই আক্কেলগুড়ুম। মাজেদা খালাকে দেখে আমার মাথায় নতুন একটা বাগধারা তৈরি হলো।–দৃষ্টিগুড়ুম আক্কেলগুড়ুমে যেমন আক্কেল খুবড়ি খেয়ে পড়ে, দৃষ্টিগুড়ুমে দৃষ্টিরও সেই অবস্থা হয়। আমার দৃষ্টি খুবড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। খালা হুলুস্কুল আকার ধারণ করেছেন। ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়েছেন। ইচ্ছা করলেই বিশ্বের এক নম্বর মোটা মহিলা হিসেবে তিনি যে-কোনো সার্কাস পার্টিতে জয়েন করতে পারেন। আমি নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম—ইয়া হু।

মাজেদা খালা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কী বললি?

আমি বিনীতভাবে বললাম, ইয়া হু বলেছি।

খালা বললেন, ইয়া হু মানে কী?

ইয়া হুর কোনো মানে নেই। আমরা যখন হঠাৎ কোনো আবেগে অভিভূত হই তখন নিজের অজান্তেই ইয়া হু বলে চিৎকার দেই। যারা ইসলামি ভাবধারার মানুষ, তারা বলে ইয়া আলি।

ইয়া হু বলার মতো কী ঘটনা ঘটেছে?

আমি বললাম, ঘটনা তুমি ঘটিয়েছ খালা। তোমার যে অবস্থা তুমি যেকোনো সুমো রেসলারকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের মতো কুৎ করে গিলে ফেলতে পোর। ব্যাটা বুঝতেও পারবে না।

খালা হতাশ গলায় বললেন, গত বছর শীতের সময় টনশিল অপারেশন করিয়েছি, তারপর থেকে এই অবস্থা। রোজ ওজন বাড়ছে। খাওয়া-দাওয়া এখন প্রায় বন্ধ। কোনো লাভ হচ্ছে না। বাতাস খেলেও ওজন বাড়ে। গত পনেরো দিন ভয়ে ওজন করি নি।

ভালো করেছ। ওজন নেয়ার স্টেজ তুমি পার করে ফেলেছ।

আমাকে নিয়ে তোর বক্তৃতা দিতে হবে না। তোকে এ জন্যে ডাকি নি। আরো সিরিয়াস ব্যাপার আছে। তুই চুপ করে বোস। কিছু খাবি?

না।

মাজেদা খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার কোনো কথায় না বলবি না। আমি না শুনতে পারি না। গরম গরম পরোটা ভেজে দিচ্ছি, খাসির রেজালা দিয়ে খা। আমার নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্যদের খাইয়ে কিছুটা সুখ পাই। বাসি পোলাও আছে। পরোটা খাবি না-কি বাসি পোলাও গরম করে দেব?

দুটাই দাও।

মাজেদা খালার বিরক্ত মুখে এইবার হাসি দেখা গেল। তিনি সত্যি সত্যি থপথপ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। এই মহিলাকে দেড় বছর পর দেখছি। দেড় বছরে শরীরকে হুলুস্কুল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা। বিস্ময় হজম করতে আমার সময় লাগছে।

তুমি হিমু না?

আমার পিছন দিকের দরজা দিয়ে খালু সাহেব ঢুকেছেন। তিনি এই দেড় বছরে আরো রোগী হয়েছেন। চিমশে মেরে গেছেন। মানুষের চোখে হতাশ ভাব দেখা যায়ইনার শরীরের চামড়ায় হতাশ ভােব চলে এসেছে। তিনি অসীম বিরক্তি নিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছি— কোনো বাড়িতে যদি কেউ একজন আমাকে খুব পছন্দ করে তাহলে আরেকজন থাকবে যে আমাকে সহাই করতে পারবে না। যতটুকু ভালোবাসা ঠিক ততটুকু ঘৃণায় কাটাকাটি। সাম্যাবস্থা, ন্যাচারাল ইকুইলিব্রিয়াম।

খালু সাহেব বললেন, তুমি এখানে বসে আছ কেন? আমার যতদূর মনে পড়ে তোমাকে আমি বিশেষভাবে বলেছিলাম, ভবিষ্যতে কখনো এ বাড়িতে পা দেবে না। বলেছিলাম না?

জি বলেছিলেন।

তাহলে এসেছি কেন?

খালা খবর পাঠিয়ে এনেছেন। তার কী একটা সমস্যা নাকি হয়েছে।

তুমি সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে? আমি আমার জীবনে তোমাকে কোনো সমস্যার সমাধান করতে দেখি নি। তুমি যে-কোনো তুচ্ছ সমস্যাকে ঘোট পাকিয়ে দশটা ভয়াবহ সমস্যায় নিয়ে যাও। সমস্যা তখন মাথায় উঠে জীবন অতিষ্ঠা করে তুলে। তুমি এক্ষুণি বিদেয় হও।

চলে যাব।

অবশ্যই চলে যাবে।

বাসি পোলাও, রেজালা এবং গরম গরম পরোটা ভেজে এনে খালা যখন দেখবেন। আমি নেই, তখন খুব রাগ করবেন।

সেটা আমি দেখব।

খাবারগুলি তখন আপনাকে খেতে হতে পারে।

আমার সঙ্গে রসিকতা করবে না। তোমার সস্তা রসিকতা অন্যদের জন্যে রেখে দাও। গোপাল ভাড় আমার পছন্দের চরিত্র না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। চলে যাবার উদ্দেশ্যে যে উঠে দাঁড়ালাম তা না। যাচ্ছি। যাব। যাচ্ছি। যাব করতে থাকিব, এর মধ্যে খালা এসে পড়বেন। পরিস্থিতি তিনিই সামলাবেন।

খালু সাহেব থমথমে গলায় বললেন, এই যে তুমি যাচ্ছি। আর কখনো এ বাড়িতে পা দেবে না। নেভার এভার। তোমাকে এ বাড়ির সোফায় বসে থাকতে দেখা অনেক পরের ব্যাপার,

এ বাড়িতে তোমার নাম উচ্চারিত হোক তাও আমি চাই না। এ বাড়ির জন্যে তুমি নিষিদ্ধ চরিত্র।

জি আচ্ছা।

এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? হাঁটা শুরু করা। ব্যাক গিয়ার।

মাজেদা খালা যে পর্বতের সাইজ নিয়ে নিচ্ছেন–এই নিয়ে কিছু ভেবেছেন?

ভাবলেও আমার ভাবনা তোমার সঙ্গে শেয়ার করার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

জি আচ্ছা।

তোমার ত্যাদাঁড়ামি অনেক সহ্য করেছি, আর না।

আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, যাবার আগে আমি শুধু একটা কথা জানতে চাচ্ছি। কথাটা জেনেই চলে যাব। ভুলেও এদিকে পা বাড়াব না।

কী কথা?

এই যে আপনি বলেছেন–তোমার ত্যাঁদড়ামি আর সহ্য করব না। ত্যাঁদড়ামি শব্দটা কোত্থেকে এসেছে? বান্দর থেকে এসেছে বান্দরামি। সেই লজিকে ত্যাদড় থেকে আসবে ত্যাঁদড়ামি। ত্যাঁদড় কোন প্রাণী?

খালু সাহেবের মুখ দেখে মনে হলো, একটা থাপ্পড় দিয়ে আমার মাঢ়ির দুএকটা দাঁত ফেলে দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে তিনি দরজার দিকে আঙুল উচিয়ে আমাকে ইশারা করলেন। আমি সুবোধ বালকের মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়লাম। ঘটাং শব্দ করে খালু সাহেব দরজা বন্ধ করে দিলেন। তবে আমি চলে গেলাম না। বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান পেতে রাখলাম ড্রয়িং রুমের দিকে। যেই মুহূর্তে ড্রয়িংরুমে খালা এন্ট্রি নেবেন সেই মুহুর্তে আমি কলিংবেল টিপব। আমার নিজের স্বার্থেই খালার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জন্যে প্রয়োজন। কারণ খালা আমাকে লিখেছেন–

হিমুরে,
তুই আমাকে একটা কাজ করে দে। কাজটা ঠিকমতো করলেই তোকে এক হাজার অষ্ট্রেলিয়ান ডলার দেয়া হবে। তোর পারিশ্রমিক।
মাজেদা খালা।
পুনশ্চ : ১. তুই কেমন আছিস? পু
নশ্চ : ২, আমি আর বাঁচব না রে।

এক হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার ঠিক কত টাকা তা আমি জানি না। আমার এই মুহুর্তে দরকার বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ বিশ হাজার টাকা। খালার সঙ্গে নেগোসিয়েশনে যেতে হবে। অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বদলে আমাকে বাংলাদেশী টাকায় সেটেলমেন্ট করতে হবে।

ড্রয়িংরুমে খালার গলা শোনা যাচ্ছে। আমি কলিংবেল চেপে ধরে থাকলাম। যতক্ষণ দরজা খোলা না হবে ততক্ষণ বেল বাজতেই থাকবে।

খালা দরজা খুলে দিলেন। আমি আবার এন্ট্রি নিলাম। বসার ঘর শত্রুমুক্ত। খালু সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না।

মাজেদা খালা বিস্মিত গলায় বললেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি? তোর খালুকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল তাকে দেখেই না-কি তুই ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিস। ঘটনা। কী?

আমি বললাম, খালা, উনাকে কেন জানি খুব ভয় লাগে। তাকে ভয় লাগার কী আছে? দিন দিন তোর কী হচ্ছে? নিজের আত্মীয়স্বজনকে ভয় পেতে শুরু করেছিস। কোনদিন শুনব তুই আমার ভয়েও অস্থির। খাবার ডাইনিং রুমে দিয়েছি, খেতে আয়।

ডাইনিং রুমে খালু সাহেব বসে নেই তো?

থাকলে কী? আশ্চর্য তুই তো দেখি মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছিস। রোগা চিমশা তেলাপোকা টাইপের একটা মানুষ। তাকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

খালু সাহেব ডাইনিং রুমের চেয়ারে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে মুখের উপর থেকে কাগজ সরিয়ে একবার শুধু দেখলেন, আবার কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। যে দৃষ্টিতে দেখলেন সেই দৃষ্টির নাম সর্পদৃষ্টি। ছোবল দেবার আগে এই দৃষ্টিতে তারা শিকারকে দেখে নেয়। আমি বললাম, খালু সাহেব ভালো আছেন?

তিনি জবাব দিলেন না। মাজেদা খালা বললেন, এ কী! তুমি ওর কথার জবাব দিচ্ছি না কেন? বেচারা এমনিতেই তোমাকে ভয় পায়। এখন যদি কথারও জবাব না দাও, তাহলে তো ভয় আরো পাবে।

খালু সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আমি কাগজ পড়ছিলাম। কী বলেছে শুনতে পাই নি।

মাজেদা খালা বললেন, হিমু জানতে চাচ্ছে তুমি ভালো আছ কিনা।

আমি ভালো আছি।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, এই তো আবার মিথ্যা কথা বললে। তুমি ভালো আছ কে বলল? তোমার পেটের অসুখ। ডিসেনট্রি। দুদিন ধরে অফিসেও যাচ্ছ না। ফট করে বলে ফেললে ভালো আছি। তুমি জানো কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়, পালপিটিশন হয়। হিমুকে সত্যি কথাটা বলো। বলে যে তোমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।

খালু সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললেন—আমার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। ডিসেনন্ট্রির মতো হয়েছে। দিনে দশ-বারোবার টয়লেটে যেতে হচ্ছে। গত দুদিন অফিসে যাই নি। আজও অফিস কামাই হবে।

খালুর সত্যভাষণে মাজেদা খালার মুখে হাসি দেখা গেল। খালা বললেন, ঠিক আছে, এখন তুমি খবরের কাগজ নিয়ে তোমার ঘরে যাও। হিমুর সঙ্গে আমার কিছু অত্যন্ত জরুরি কথা আছে।

খালু সাহেব কোনো কথা বললেন না, কাগজ হাতে উঠে চলে গেলেন। তাকে দেখাচ্ছে যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দি জেনারেলের মতো। যে জেনারেল শুধু যে পরাজিত এবং বন্দি তা না, তিনি আবার বন্দি অবস্থায় পেটের অসুখও বাধিয়ে ফেলেছেন। অস্ত্রগোলাবারুদের চিন্তা তার মাথায় নেই, এখন শুধু মাথায় পানি ভর্তি বদনার ছবি।

খালার জরুরি কথা হলো তাঁর এক বান্ধবী (মিসেস আসমা হক, পিএইচডি) দীর্ঘদিন অস্ট্রেলীয়া প্রবাসী। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেনআর হবে না। তারা বাংলাদেশ থেকে একটা বাচ্চা দত্তক নিতে চান।

মাজেদা খালা বললেন, কী রে হিমু, জোগাড় করে দিতে পারবি না?

আমি বললাম, অবশ্যই পারব। এটা কোনো ব্যাপারই না। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বেবি জোগাড় করে দেব।

এক্সপোর্ট কোয়ালিটি মানে?

কালাকোলা, বেঁকা বেবি না, পারফেক্ট গ্রাক্সো বেবি। দেখলেই গালে চুমু খেতে ইচ্ছা! করবে। থুতনিতে আদর করতে ইচ্ছা করবে। স্পেসিফিকেশন কী বলো। কাগজে লিখে নিই।

স্পেসিফিকেশন আসমা লিখেই পাঠিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনিশ-বিশ হতে পারে। আবার কয়েকটা জায়গায় ওরা খুবই রিজিড। যেমন ধর, বাচ্চার মুখ হতে হবে।

গোল। লম্বা হলেও চলবে না, ওভাল হলেও চলবে না।

গোল হতে হবে কেন?

খালা বললেন, আসমা এবং আসমার স্বামী দুজনের মুখই গোল। এখন ওদের যদি একটা লম্বা মুখের বাচ্চা থাকে তাহলে কীভাবে হবো লম্বা মুখের বাচ্চা দেখেই লোকজন সন্দেহ করবে। হয়তো এদের বাচ্চা না। মূল ব্যাপার হলো–বাচ্চাটাকে দেখেই যেন মনে হয় ওদেরই সন্তান।

আর কী কী বিষয়ে তারা রিজিড?

বাচ্চার বয়স হতে হবে দুই থেকে আড়াই-এর মধ্যে। দুইয়ের নিচে হলে চলবে না, আবার আড়াইয়ের উপরে হলেও চলবে না।

আমি বললাম, মাত্র জন্ম হয়েছে এরকম বাচ্চা নেয়াই তো ভালো। এ ধরনের বাচ্চা বাবা-মাকে চিনে না। আশেপাশে যাদের দেখবে তাদেরই বাবামা ভাববে।

খালা বললেন, ন্যাদা-প্যাদা বাচ্চ ওরা নেবে না। বাচ্চার হাগামুতা তারা পরিষ্কার করতে পারবে না। আসমার আবার শুচিবায়ুর মতো আছে।

আমি বললাম, দুবছরের বাচ্চারও তো শুচু করাতে হবে। সেটা কে করাবে? যে মহিলার শুচিবায়ু আছে সে নিশ্চয়ই অন্যের বাচ্চাকে শুচু করাবে না।

খালা বললেন, এটা তো চিন্তা করি নি।

তুমি বরং উনাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। আমার তো মনে হচ্ছে উনার দরকার টয়লেট ট্রেইন্ড বেবি।

আমি এক্ষুণি টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি। তুই বরং এই ফাঁকে আসমার পাঠানো স্পেসিফিকেশনটা মন দিয়ে পড়।

ছেলে বাচ্চানা মেয়ে বাচা?

ছেলেবাচ্চা।

ছেলে বাচা কেন?

খালা বললেন, আসমার স্বামীর পছন্দ ছেলেবাচ্চা। স্বামীয় পছন্দটাকেই আসমা গুরুত্ব দিচ্ছে। যদিও আসমার খুব শখ ছিল মেয়েবাচ্চার। কারণ বিদেশে মেয়েদের অনেক সুন্দর সুন্দর ড্রেস পাওয়া যায়। ছেলেদের তো একটাই পোশাক। শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্ট।

গায়ের রঙ?

গায়ের রঙ শ্যামলা হতে হবে। আসমা এবং আসমার স্বামী দুজনই কুচকুচে কালো।

সেখানে ধবধবে ফরসা বাচা মানাবে না।

আমি বললাম, অত্যন্ত খাঁটি কথা। কার্পেট সবুজ রঙের হলে সোফার কাভারের রঙও সবুজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, এটা কী রকম কথা? মানুষ আর কার্পেট এক হলো? তুই কি পুরো বিষয়টা নিয়ে রসিকতা করছিস?

মোটেই রসিকতা করছি না। আমার টাকার দরকার। অস্ট্রেলিয়ান এক হাজার ডলারে আমার কাজ হবে না। আমার দরকার বাংলাদেশী টাকায় এক লাখ বিশ হাজার টাকা।

এত টাকা দিয়ে তুই করবি কী?

টাকার দরকার আছে না? সাধু-সন্ন্যাসীদেরও টাকা লাগে। আমি তো কোনো সাধুসন্ন্যাসী না।

টাকার কোনো সমস্যা হবে না। তুই জিনিস দে।

আমি যথাসময়ে মাল সাপ্লাই দেব–তুমি এটা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

খালা রাগী গলায় বললেন, কুৎসিতভাবে কথা বলছিস কেন? মাল আবার কী?

তুমি বললে জিনিস, আমি বলেছি মাল। ব্যাপার তো একই।

ব্যাপার মোটেই এক না। এ ধরনের অভদ্র ল্যাঙ্গুয়েজ আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। খবরদার খবরদার।

ঠিক আছে আর উচ্চারণ করব না। তুমি স্পেসিফিকেশনগুলো দিয়ে উনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে বাচ্চার বয়সটা জেনে দাও।

খালা বিরক্ত মুখে কম্পিউটারে কম্পোজ করা দুটা পাতা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে টেলিফোন করতে গেলেন। কাগজ দুটিতে সবই বিস্তারিতভাবে লেখা—

গুণ –শর্ত –মন্তব্য

সেক্স—ছেলে –অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

মুখের শেপ — গোলাকার –অবশ্যই গোলাকার হতে হবে। এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

রঙ—শ্যামলা –শিথিলযোগ্য। তবে অবশ্যই ধবধবে ফরসা চলবে না।

বয়স—২৪ থেকে ৩০ মাস—আবশ্যকীয় শর্ত।

ওজন—২৫ থেকে ৩০ পাউন্ড—শিথিলযোগ্য তবে ওজন ২০ পাউন্ডের নিচে হলে চলবে না।

চোখের রঙ—কালো—আবশ্যকীয় শর্ত।

নাক—খাড়া—শিথিলযোগ্য শর্ত। তবে অতিরিক্ত থ্যাবড়া চলবে না।

বুদ্ধি –এভারেজের উপরে –আবশ্যকীয় শর্ত।

স্বভাব ও মানসিকতা –শান্ত স্বভাব –শিথিলযোগ্য। চঞ্চল স্বভাবও গ্রহণযোগ্য, তবে অবশ্যই ছিচকাঁদুনি চলবে না।

গলার স্বর—মিষ্টি –আবশ্যকীয় শর্ত।

সন্তানের বাবা-মার শিক্ষাগত যোগ্যতা—দুজনের মধ্যে অন্তত –আবশ্যকীয় শর্ত। একজনকে গ্রাজুয়েট হতে হবে।

সন্তানের বাবা-মার বিবাহিত জীবন –সুখী হতে হবে –আবশ্যকীয় শর্ত। ডিভোর্সি চলবে না।

ধর্ম—ইসলাম –অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

বিশেষ মন্তব্য: পিতৃপরিচয় নেই এমন সন্তান কখনো কোন অবস্থাতেই চলবে। না। পিতা-মাতার পরিবারে পাগলামির ইতিহাস থাকলে চলবে না। ফ্ল্যাট ফুট চলবে। না। মঙ্গোলয়েড বেবি চলবে না। জোড়া ভুরু চলবে না। লেফট হ্যান্ডার চলবে না। তবে কোনো শিশু যদি বাকি সমস্ত শর্ত পুরো করে তাহলে লেফট হ্যান্ডার বিবেচনা করা যেতে পারে।

পড়া শেষ করে আমি মনে মনে তিনবার বললাম, আমারে খাইছেরে। এর মধ্যে টেলিফোন শেষ করে খালা আনন্দিত মুখে বললেন, বয়স যা লেখা আছে তাই। আসমা বলেছে সে ডিসপোজেবল গ্লাভস পরে শুচু করাবে। এখন বল কবে নাগাদ তুই পারবি?

আমি বললাম, সাত দিনে।

খালা বললেন, বেকুবের মতো কথা বলবি না। সাত দিনে তুই জোগাড় করে ফেলবি?

অবশ্যই। আর্জেন্ট অর্ডারে আর্জেন্টি মাল ডেলিভারি।

স্পেসিফিকেশনগুলি ঠাণ্ডা মাথায় পড়ে দেখেছিস?

দেখেছি, জটিল ব্যাপার। তবে যত জটিল তত সোজা। সত্যি কথা বলতে কী, আমার হাতেই একজন আছে। প্রয়োজনে চব্বিশ ঘণ্টায় মাল ডেলিভারি দিতে পারি।

খালা বিরক্ত মুখে বললেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুই আজেবাজে জিনিস গছিয়ে দেবার তালে আছিস।

তোমরা যাচাই করে নেবে। একটা জিনিস কিনবে, দেখে নেবে না?

জিনিস কেনার কথা আসছে। কোত্থেকে?

একই হলো।

মোটেই এক হলো না। এ ধরনের কথা তুই ভুলেও উচ্চারণ করবি না। যে বাচ্চাটা তোর হাতে আছে তার নাম কী?

ইমরুল।

এটা আবার কেমন নাম! শুনলেই চিকেনরোলের কথা মনে হয়। ইমরুল চিকেনরোল।

তোমার বান্ধবী নিশ্চয়ই নাম বদলে নতুন নাম রাখবে। তাদের যেহেতু টাকার অভাব নেই তারা নাম চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারে। যার নাম সিলেক্ট হবে তার জন্যে ঢাকা-অস্ট্রেলিয়া-ঢাকা রিটার্ন টিকিট।

খালা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আজ বিকেলের মধ্যে ছেলের একটা ছবি নিয়ে আয়, আমি ইন্টারনেটে পাঠিয়ে দেব। ছবি পছন্দ হলে আসমাকে বলব। সে যেন এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসে।

আমি বললাম, এখন আমাকে বায়নার টাকা দাও।

বায়নার টাকা মানে?

ইমরুলকে বায়না করলে বায়নার টাকা দেবে না?

কত দিতে হবে?

আপাতত বিশ হাজার দাও। জিনিস ডেলিভারির সময় বাকিটা দিলেও হবে।

কিছু না দেখেই বায়নার টাকা দেব? ছবিও তো দেখলাম না। এতগুলো টাকা কোন ভরসায় দেব?

আমার ভরসায় দেবে। আমি কি ভরসা করার মতো না?

মাজেদা খালা বিড়বিড় করে বললেন, তোর উপর ভরসা অবশ্যি করা যায়।

তাহলে দেরি করবে না, এখনি টাকা নিয়ে এসো। টাকা ঘরে আছে না?

আছে।

আমি টাকা শুনছি, এমন সময় খালু সাহেব বের হয়ে এলেন। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কিসের টাকা? আমি জবাব দেবার আগেই খালা বললেন, তোমার এত কথা জানার দরকার কী? খালু সাহেব সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলেন। ক্ষমতাবান কোনো মানুষকে চোখের সামনে চুপসে যেতে দেখলে ভালো লাগে। আমি খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললাম, খালু সাহেব, আপনার পেটের অবস্থা কী? তিনি জবাব দিলেন না। চুপিসানো অবস্থা থেকে নিজেকে বের করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। লাভ হলো না। ফুটো হওয়া বেলুন ফুলানো মুশকিল। যতই গ্যাস দেয়া হোক ফুস করে ফুটো দিয়ে গ্যাস বের হয়ে যাবে। খালার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি ইমরুলের বাসার দিকে রওনা হলাম। ইমরুলের বাবার হাতে টাকাটা পৌঁছে দিতে হবে।

২. টিনের চালের একতলা বাড়ি

যে কয়েকটা জিনিস ঢাকা শহর থেকে উঠে গেছে তার একটা হচ্ছে–টিনের চালের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে নারিকেল গাছ। হঠাৎ হঠাৎ যখন নারিকেল গাছওয়ালা একতলা বাড়ি দেখা যায়। তখন কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বাড়ির সৌভাগ্যবান মালিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে।

টিনের চালের একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছটা নারিকেল গাছ। মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতো। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। টিনের চালে বৃষ্টি অনেকদিন শোনা হয় না। যে সৌভাগ্যবান ভদ্রলোক এই বাড়িতে থাকেন তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে ঘোর বর্ষায় এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হওয়া যাবে।

আমি গেট খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। দরজায় কলিং বেল নেই। পুরনো আমলের কড়া নাড়া সিস্টেম। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক ভীত চোখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে বললেন, কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু। কেমন আছেন?

ভদ্রলোক কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। চুপিসানো গলায় বললেন, ভালো। আপনাকে চিনতে পারলাম না।

আমি বললাম, আমাকে চিনতে পারার কোনো কারণ নেই। আমার সঙ্গে আগে আপনার কখনো দেখা হয় নি। আমি অনেক দিন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনি না। আপনি যদি অনুমতি দেন কোনো বৃষ্টির দিনে এসে আপনার বাড়ির উঠানে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনে যাব।

ভদ্রলোকের চোখে ভয়ের ভাব আরো প্রবল হলো। তিনি কিছুই বললেন না। আমি বললাম, আমাকে মনে হয় আপনি ভয় পাচ্ছেন। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি খুবই নিরীহ মানুষ। আচ্ছা আজ যাই, কোনো এক বৃষ্টির দিনে চলে আসব।

ভদ্রলোক তারপরেও কোনো কথা বললেন না। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথ্যা বের করে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন না। আমি যখন গেট পার হয়ে রাস্তায় পা দিয়েছি তখন তিনি ডাকলেন—একটু শুনে যান।

আমি ফেরত এলাম। ভদ্রলোক বললেন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

হাবিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা এই। ঝড়-বাদলার দিনে আমি এই বাড়িতে উপস্থিত হই। হাবিবুর রহমান সাহেব আমাকে দেখে খুব যে খুশি হন তা না। কিছুটা সন্দেহ নিয়েই তিনি আমাকে দেখেন, তবে তাঁর স্ত্রী ফরিদা অত্যন্ত খুশি হয়। আনন্দে ঝলমল করতে করতে বলে, বৃষ্টি-ভাই আসছে। আমার বৃষ্টি-ভাই আসছে। বৃষ্টি-বাদলা উপলক্ষে ফরিদা বিশেষ বিশেষ রান্না করে। প্রথম দফায় হয় চালভাজা। কাচামরিচ, সরিষার তেল, পিঁয়াজ দিয়ে মাখানো চালভাজাকে মনে হয় বেহেশতি কোনো খানা। রাতে হয় মাংস-খিচুড়ি। সামান্য খিচুড়ি, ঝোল ঝোল মাংস এত স্বাদু হয় কিসের গুণে কে জানে!

ফরিদা আমাকে দেখে যে রকম খুশি হয়— তার ছেলে ইমরুলও খুশি হয়। এই খুশির কোনোরকম ন্যাকামি সে দেখায় না। বরং ভাব করে যেন আমাকে চিনতে পারছে। না। শুধু যখন আমার চলে যাবার সময় হয় তখন মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে। কাঁদতে থাকে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলে–হিমু যাবে না। হিমু থাকবে।

ইমরুল বারান্দায় বসে ছবি আঁকছিল। আমাকে দেখেই ফিক করে হেসে অন্য দিকে ঘুরে বসল। দুহাত দিয়ে ছবি ঢেকে ফেলল।

আমি বললাম, অন্য দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? আমার দিকে তাকা। ইমরুল তাকাল না। গভীর মনোযোগে ছবি আঁকতে থাকল। সে সাধারণ ছবি আঁকতে পারে। না। রাক্ষসেরা ছবি আঁকে। তবে ভয়ঙ্কর রাক্ষস না। প্রতিটি রাক্ষস হাস্যমুখী। আমাকে চিনতে না পারা হলো ইমরুলের স্বভাব। তার সঙ্গে যতবার দেখা হয় ততবারই প্রথম কয়েক মিনিট ভাব করে–যেন আমাকে চিনতে পারছে না।

আমি বললাম, তোর খবর কী রে?

ইমরুল জবাব দিল না। আমাকে চিনতে পারছে না–এখন সে এই ভাবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

কিসের ছবি আঁকছিস?

রাক্ষসের।

কোন ধরনের রক্ষস? পানির রাক্ষস না-কি শুকনার রাক্ষস?

পানির রাক্ষস।

রাক্ষসটার নাম কী?

নাম দেই নাই।

নাম না দিলে হবে? তোর নিজের নাম আছে আর রাক্ষসটার নাম থাকবে না?

তুমি নাম দিয়ে দাও।

রাক্ষসটা কেমন এঁকেছিস দেখা, তারপর নাম ঠিক করব। চেহারার সাথে তার নামের মিল থাকতে হবে। কানা রক্ষসের নাম পদ্মলোচন রাক্ষস দেয়া যাবে না। তোর বাবা কি বাসায় আছে?

হুঁ।

আমি তোর বাবার কাছে যাচ্ছি। ছবি আঁকা শেষ হলে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আকিকা করে নাম দিয়ে দেব।

আকিকা কী?

আছে একটা ব্যাপার। নাম দেয়ার আগে আকিকা করতে হয়। ছেলে রাক্ষস হলে দুটা মুরগি লাগে, মেয়ে রাক্ষসের জন্যে লাগে একটা। তুই যে রাক্ষসটা আঁকছিস সেটা ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

ঠিক আছে, ঐকে শেষ কর। ততক্ষণে তোর বাবার সঙ্গে জরুরি কিছু আলাপ করে নেই।

হাবিবুর রহমান সাহেবের বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। গত ছমাস ধরে তাকে দেখাচ্ছে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ের মতো। মাথার চুল খাবলা খাব লাভাবে পেকে গেছে। মুখের চামড়া ঝুলে গেছে। গলার স্বরেও শ্লেষ্মা মেশানো বৃদ্ধ ভাব এসে গেছে। শুধু চোখে ছানি পড়াটা বাকি। চোখে ছানি পড়লে ষোলকলা পূর্ণ হয়। গত ছমাস ধরে ভদ্রলোকের চাকরি নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা গুরুতর অসুস্থ। গত দুমাস ধরে হাসপাতালে আছে। হার্টের ভাল্বে সমস্যা হয়েছে। দূষিত রক্ত, বিশুদ্ধ রক্ত হার্টের ভেতর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের মিলমিশ বন্ধ না হলে ফরিদা জীবিত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে বের হতে পারবে এমন মনে হয় না। এক লক্ষ টাকার নিচে হাটের অপারেশন হবার সম্ভাবনা নেই। বিশ হাজার টাকা কয়েক দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

হাবিবুর রহমান ঠাণ্ডা মেঝেতে বালিশ পেতে শুয়েছেন। তাঁর গা খালি। লুঙ্গি অনেকদূর গুটানো। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেমন কিছুক্ষণ হকচকানো অবস্থায় থাকে, কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না। তার সে-রকম হলো। তিনি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে?

আমি বললাম, আমি হিমু।

ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কিছু মনে করবেন না। সরি। আমার মাথা পুরাপুরি আউলা অবস্থায় চলে গেছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে এসেছেন? বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

হচ্ছে না। তবে হবে। আপনি ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আছেন কেন?

হাবিবুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, হিমু ভাই, শরীর চড়ে গেছে। সারা শরীরে জ্বালাপোড়া। সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকলে আরাম হয়। তা-ও পুরোপুরি জ্বলুনি কমে না। বরফের চাঙের উপর শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত।

আমি বললাম, মাছপট্টি থেকে বরফের একটা চাঙ কিনে নিয়ে আসেন। দাম বেশি পড়বে না।

সত্যি কিনতে বলছেন?

হ্যাঁ। সব চিকিৎসার বড় চিকিৎসা হলো মন-চিকিৎসা। মন যদি কোনো চিকিৎসা করতে বলে সেই চিকিৎসা করে দেখা দরকার। চলুন যাই, বড় দেখে একটা বরফের চাঙ কিনে নিয়ে আসি।

হাবিবুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, আপনাকে এত পছন্দ করি। কিন্তু আপনার কথাবার্তা বেশিরভাগই বুঝতে পারি না। কোনটা রসিকতা কোনটা সিরিয়াস কিছুই ধরতে পারি না। ফরিদা দেখি ধরতে পারে। তার বুদ্ধি বেশি। তার তুলনায় আমি পাঠাশ্রেণীর।

ফরিদা আছে কেমন?

ভালো না। ভাব দেখাচ্ছে ভালো আছে। দেখা করতে গেলে ঠাট্টা ফাজলামিও করে। কিন্তু আমি তো বুঝি!

আপনি কীভাবে বুঝবেন? এইসব সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে হলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে। আপনার বুদ্ধি তো পাঠ্য-শ্রেণীর।

হাবিবুর রহমান বললেন, এইসব জিনিস বোঝা যায়। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ফরিদা পনেরো-বিশ দিনের বেশি নাই। ইমরুলকে নিয়ে কী করব আমি এই চিন্তায় অস্থির। আমার একার পক্ষে ইমরুলকে বড় করা সম্ভব না।

দত্তক দিয়ে দিন। ছেলেপুলে নেই এমন কোনো ফ্যামিলির কাছে দিয়ে দিন। ওরা পেলে বড় করুক। বড় হবার পর আপনি পিতৃপরিচয় নিয়ে উপস্থিত হবেন। ছেলে সব ফেলে-ফুলে বাবা বাবা বলে আপনার কাছে ছুটে আসবে। কোকিল। যেমন কাকের বাসায় সন্তান পালন করে, অনেকটা সে-রকম।

হিমু ভাই।

জি।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা করব কী জন্যে?

আমি আমার এত আদরের সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দেব? আমার কষ্টটা দেখবেন না?

অবশ্যই আপনার কষ্ট হবে। আপনার যতটুকু কষ্ট হবে ঠিক ততটুকু আনন্দ হবে। যে ফ্যামিলি আপনার ছেলেকে নেবে। একে বলে ন্যাচারাল ইকুইলিবিয়াম। সাম্যাবস্থা। একজনের যতটুক আনন্দ অন্যের ততটুকু দুঃখ। Conservation of Happiness। হিমুর সেকেন্ড ল অব মেন্টাল ডিনামিক্স।

হিমুর সেকেন্ড ল অব মেন্টাল ডিনামিক্স?

জি, থর্মোডিনামিক্সের লর সঙ্গে কিছু মিল আছে।

হাবিবুর রহমান দুঃখিত গলায় বললেন, হিমু ভাই, কিছু মনে করবেন নাআপনি সবসময় ধোঁয়াটে ভাষায় কথা বলেন, আমি বুঝতে পারি না। আমার খুবই কষ্ট হয়।

বুঝিয়ে দেই?

দরকার নেই, বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনাকে দেখে ভালো লাগছে এটাই বড় কথা। আপনাকে যখনই দেখি তখনই ভরসা পাই। চা খাবেন?

চা-পাতা চিনি এইসব আছে, নাকি কিনে আনতে হবে?

চা-পাতা চিনি আছে। দুধও আছে। আপনি আসবেন জানি, এই জন্যে আনিয়ে রেখেছি।

হাবিবুর রহমান চা বানাতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। পাপপুণ্য বিষয়ক যে থিওরি মাথায় এসেছে, সেই থিওরিটা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি।

জি।

হাবিবুর রহমান সাহেব।

জি।

আপনি কি নীলক্ষেতে পশুপাখির দোকানে কখনো গিয়েছেন?

জি।

টিয়া পাখির সিজনে যাবেন, দেখবেন অসংখ্য টিয়া পাখি তারা খাঁচায় বন্দি করে। রেখেছে। পঞ্চাশ টাকা করে পিস বিক্রি করে। আপনি যদি দুটা টিয়া পাখি একশ টাকায় কিনে খাঁচা খুলে পাখি দুটা আকাশে ছেড়ে দেন, ওদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেন, তাহলে কি আপনার পুণ্য হবে না?

জি, হবার কথা। এখন ভালোমতো চিন্তা করে দেখুন–আপনি যাতে পুণ্য করতে পারেন। তার জন্যে একজনকে পাপ করতে হয়েছে। স্বাধীন পাখিগুলি ধরে ধরে বন্দি করতে হয়েছে। কাজেই যতটুকু পাপ ততটুকু পুণ্য। Conservation of energy-র মতো Conservation of পাপ।

ভাই সাহেব, আপনি খুবই অদ্ভুত মানুষ। চা-টা কি বেশি কড়া হয়ে গেছে?

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, অসাধারণ চা হয়েছে। না কড়া, না পাতলা।

হাবিবুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ফরিদাও আমার হাতে বানানো চা খুব পছন্দ করে। রাতে ঘুমোতে যাবার সময় সে বলবে–এক কাপ চা বানিয়ে দাও না প্লিজ! আচ্ছা হিমু সাহেব, বেহেশতে কি চা পাওয়া যাবে?

বেহেশতে চা পাওয়া যাবে কি-না এই খোঁজ কেন নিচ্ছেন?

হাবিবুর রহমান অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, ফরিদার কথা ভেবে বলেছি। ও যে টাইপ মেয়ে, বেহেশতে যে যাবে এটা তো নিশ্চিত। তার চা এত পছন্দ। বেহেশতে চা পাওয়া গেলে সে নিশ্চয়ই আরাম করে খেত।

উনার পছন্দ আপনার হাতে বানানো চা। গোলমানদের হাতের বানানো চা খেয়ে উনি তৃপ্তি পাবেন বলে মনে হয় না। চা যত ভালোই হোক আমার ধারণা উনি ভুরু কুঁচকে বলবেন, বেহেশতের এত নামডাক শুনেছি, কই এখানকার চা তো ইমরুলের বাবার হাতের চায়ের মতো হচ্ছে না।

হাবিবুর রহমান হেসে ফেলে বললেন, মনে হচ্ছে কথাটা আপনি ভুল বলেন নি। ইমরুলের জন্মের পরের ঘটনা কি আপনাকে বলেছি?

কি ঘটনা?

ফরিদা যখন শুনল তার ছেলে হয়েছে, কেন্দো-কেটে অস্থির। ছেলেকে কোলে পর্যন্ত নিবে না।

এমন অবস্থা! কেন?

কারণ আমি চেয়েছিলাম মেয়ে হোক। ফরিদার সব কিছু আমাকে ঘিরে। এখন সে মারা যাবে বিনা চিকিৎসায়, আমি কিছুই করতে পারছি না–এটা হলো কথা।

বিশ হাজার টাকা জোগাড় হয় নি?

হাবিবুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না। চেষ্টাও করি নি।

কেন?

বিশ হাজার টাকা। যদি জোগাড় করি, বাকিটা পাব কোথায়?

আমি বললাম, সেটা অবশ্য একটা কথা।

হাবিবুর রহমান বললেন, ফরিদা আমার সঙ্গে থাকবে না–মানসিকভাবে এই সত্যি আমি মেনে নিয়েছি। ইমরুলকে কীভাবে বোঝাব মাথায় আসছে না।

আমি বললাম, এইসব জটিল জিনিস ছোটরা খুব সহজে বুঝতে পারে। ইমরুলকে নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না।

আরেক কাপ চা কি দেব হিমু ভাই?

দিন আরেক কাপ।

আমি দুকাপ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললাম, ও আচ্ছা, ইমরুলের জন্মদিনের উপহার তো দেয়া হলো না। আজ উপহার নিয়ে এসেছি। ঐদিন খালি হাতে জন্মদিনে এসেছিলাম। তখনই ভেবে রেখেছি। পরে যখন আসব। কোনো উপহার নিয়ে আসব।

হাবিবুর রহমান বললেন, কী যে আপনি করেন হিমু ভাই। গরিবের ছেলের আবার জন্মদিন কী? তারিখটা মনে রেখে আপনি যে এসেছেন এই খুশিই আমার রাখার জায়গা নাই। কী গিফট এনেছেন?

ক্যাশ টাকা এনেছি। গিফট কেনার সময় পাই নি।

আমি টাকার বান্ডিলটা হাবিবুর রহমান সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলাম। হাবিবুর রহমান সাহেব অনেকক্ষণ টাকার বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, এখানে বিশ হাজার টাকা আছে, তাই না?

আমি বললাম, হুঁ।

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। চোখের পানি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি লক্ষ করেছি, শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের চোখের পানি দেখতে ভালো লাগে।

পুরুষ মানুষের চোখের পানি দেখা মাত্রই রাগ ভাব হয়। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার চোখের পানি বিরক্তি তৈরি করে।

আমি হাবিবুর রহমান সাহেবের চোখের পানি কিছুক্ষণ দেখলাম। আমার রাগ উঠে গেল। আমি তার দিকে না তাকিয়ে বললাম, যাই। তিনি জবাব দিলেন না। আমি চলে এলাম বারান্দায়। ইমরুল এখনো ভূতের ছবি একে যাচ্ছে। আমি বললাম, ইমরুল যাই। সে মাথা নিচু করে ফেলল। এটা তার কান্নার প্রস্তুতি। আমি চলে যাচ্ছি— এই দুঃখে সে কিছুক্ষণ কাঁদবে। আগে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত। এখন মা পাশে নেই। কাঁদার ব্যাপারটা তাকে একা একা করতে হয়।

কাঁদছিস না-কি?

হুঁ।

ভালোই হলো। বাপ-বেটা দুজনের চোখেই জল। চোখের জলে চোখের জলে ধুল পরিমাণ। মাকে দেখতে যাবি?

না।

না কেন? মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না?

ইমরুল জবাব দিল না। চোখ মুছে ফোঁপাতে লাগল। ইমরুলের চরিত্রের এই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। যে মায়ের জন্যে তাঁর এত ভালোবাসা অসুস্থ হবার পর

সেই মারি প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই কেন? সে কি ধরেই নিয়েছে মা আর সুস্থ হয়ে ফিরবে না?

কিরে ব্যাটা, মাকে দেখতে যাবি না? চল দেখে আসি?

না।

তাহলে একটা কাজ কর— রাক্ষসেরা ছবিটা দিয়ে দে, তোর মাকে দিয়ে আসি। ছবির এক কোনায় লাল রঙ দিয়ে লিখে দে— মা। মা লিখতে পারিস?

পারি।

সুন্দর করে মা লিখে চারদিকে লতা-ফুল-গাছ দিয়ে ডিজাইন করে দে। পারবি না।

পারব।

পারলে তাড়াতাড়ি কর। কান্না বন্ধ। কাঁদতে কাঁদতে যে ডিজাইন করা হয়। সে ডিজাইন ভালো হয় না।

ইমরুল কান্না থামিয়ে ডিজাইন করার চেষ্টা করছে। কান্না পুরোপুরি থামছে না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কিছুক্ষণ পর পর উঠে আসছে। আচ্ছা— কান্নার সঙ্গে তো সমুদ্রের খুব মিল আছে। সমুদ্রের জল নোনা। চোখের জল নেন। সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। কান্নাও আসে ঢেউয়ের মতো।

কোনো কোনো মানুষকে কি অসুস্থ অবস্থায় সুন্দর লাগে? ব্যাপারটা আগে তেমনভাবে লক্ষ করি নি। ফরিদাকে খুবই সুন্দর লাগছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এইমাত্র গরম পানি দিয়ে গোসল করে সেজেগুজে বসে আছে। কোথাও বেড়াতে যাবে। গাড়ি এখনো আসে নি বলে অপেক্ষা। আমি বললাম, কেমন আছ ফরিদা?

ফরিদা বলল, খুব ভালো।

আমি বললাম, তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে–খুব ভালো আছ। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে?

রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাই। ঘুম তো ভালো হবেই। তবে কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি।

কেন?

সেটা আপনাকে বলা যাবে না।

ফরিদা মুখ টিপে হাসছে। দুষ্টুমির হাসি। এইসব দুষ্টুমির ব্যাপার তার মধ্যে আগে ছিল না। ইদানীং দেখা দিয়েছে।

ইমরুল তোমার জন্যে উপহার পাঠিয়েছে, ভূতের ছবি। আমি স্কচ টেপ নিয়ে এসেছি। এই ছবি আমি তোমার খাটের পেছনের দেয়ালে লাগিয়ে দেব। ডাক্তাররা রাগ করবে না তো?

রাগ করতে পারে।

ছেলে মার জন্যে ছবি এঁকে পাঠিয়েছে–এটা জানলে রাগ নাও করতে পারে।

আমি ছবি টানিয়ে দিলাম। ফরিদা মুগ্ধ চোখে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ ছলছল করতে লাগল।

হিমু ভাইজান

বলো।

ইমরুল আমাকে দেখতে আসতে চায় না–এটা কি আপনি জানেন?

জানি না।

ও আসতে চায় না। সে যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি, হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসতে রাজি না। কেন বলুন তো।

মনে হয়। হাসপাতাল তার পছন্দ না।

ফরিদা বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আমার ধারণা সে বুঝে ফেলেছে আমি বাঁচব না। এই জন্যে আগে থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। আমার ধারণা কি ঠিক হিমু ভাই?

আমি বললাম, ঠিক হতে পারে।

ফরিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি মরে গেলে ওর বাবা ওকে নিয়ে বিরাট বিপদে পড়বে। ঠিক না হিমু ভাই?

আমি বললাম, বিপদে তো পড়বেই।

ও কী করবে বলে আপনার ধারণা?

প্রথম কিছুদিন খুব কান্নাকাটি করবে। তারপর ইমরুলের দেখাশোনা দরকার–এই অজুহাতে অল্পবয়সী একটি তরুণী বিয়ে করবে। তরুণীর মন জয়ের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকবে। প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। যে তার প্রথম স্ত্রীর চেয়ে এই স্ত্রী মানুষ হিসেবে অনেক ভালো। প্রায় তুলনাহীন।

ফরিদা হাসছে। প্রথমে চাপা হাসি, পরে শব্দ করে হাসি। সে মনে হলো খুবই মজা পাচ্ছে। হাসি থামাবার জন্যে তাকে মুখে আচল চাপা দিতে হলো।

হিমু ভাই।

বলো।

আমার মৃত্যুর পর আপনি যা করবেন তা হলো ছেলে-মেয়ে নেই এমন কোনো পরিবারে ইমরুলকে দত্তক দিয়ে দেবেন। যাতে ওরা তাকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

ফরিদা দুঃখিত গলায় বলল, আপনি এত সহজে আচ্ছা বললেন? আপনার আচ্ছা! বলতে একটুও মন খারাপ হলো না? আপনি যে হৃদয়হীন একজন মানুষ–এটা কি আপনি জানেন হিমু ভাই?

আমি হাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

৩. মিসেস আসমা হক পিএইচডি

মিসেস আসমা হক
পিএইচডি
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার সালাম গ্রহণ করুন। আশা করি মঙ্গলময়ের অসীম করুণায় আপনি সুস্থ দেহে সুস্থ মনে শান্তিতে বাস করিতেছেন। আপনার স্বামীকেও আমার আসসালাম। আল্লাহপাকের কাছে আপনাদের সুখ কামনা করি। আল্লাহপাক গুনাহগার বান্দার দেয়া কবুল কর। আমিন।

এখন কাজের কথায় আসি— জনাবা, আমার কোম্পানি হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড] আপনার জিনিস ডেলিভারি দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। আমার কোম্পানি আপনার জন্য যে শিশুটি বাছিয়া রাখিয়াছে ইনশাআল্লাহ সে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আপনি মাজেদা খালার পূর্বপরিচিত। আপনার কাছে বাজে মাল গছাইব না। এতে কোম্পানির সম্মানহানী হয় এবং আত্মীয়স্বজনের কাছেও মুখ ছোট হয়। আমার কোম্পানি একদিনের ব্যবসায়ী নয়। সুনামের সাথে আমরা দীর্ঘদিন ব্যবসা করিব ইহাই আমাদের অঙ্গীকার। আমার কোম্পানি যে শিশুটিকে ঠিক করিয়াছে তাহার নাম ইমরুল। আপনি যে-সব শর্ত আরোপ করিয়াছেন এই শিশুটি ইনশাল্লাহ সব শর্তই পূরণ করে। দুই একটি ক্ষেত্রে একটু উনিশ-সাড়ে উনিশ হইতে পারে। ইহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আপনি শিশুটির ওজন পঁচিশ হইতে ত্রিশ পাউন্ডের ভিতর থাকিতে হইবে–এমন শর্ত দিয়াছেন। ইমরুলের ওজন তার চেয়ে কম।

সে খুব অসুখ-বিসুখে ভুগে বলিয়া শরীরের ওজনের তেমন বৃদ্ধি নাই। কয়েকদিন যাবত সে হামে শয্যাশায়ী। খাওয়া-দাওয়া কমিয়া গিয়াছে। সে আরোগ্য লাভ করা মাত্র হাইপ্রোটিন ডায়েটের মাধ্যমে তার ওজন বৃদ্ধি করা হইবে। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে বাংলাদেশে চিকন স্বাস্থ্য মোটা করিবার ভালো ব্যবস্থা আছে। বড় বড় রাস্তার দুই পাশে সচিত্র বিজ্ঞাপন আছে— চিকন স্বাস্থ্য মোটা করা হয়। আমি এদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া সঠিক পন্থা অবলম্বন করিব। শিশু ডেলিভারি নিবার পূর্বে আপনার সামনে তাকে ওজন করা হইবে।

ইমরুলের একটি 3R সাইজ ছবি পাঠাইলাম। ছবিতে সে একটু বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা কোনো শারীরিক ত্রুটি নহে। ছবি তুলিবার সময় কেন জানি সে খানিকটা ডান দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়। ফুল ফিগারের এই ছবিতে তার মুখাবয়ব স্পষ্ট নয় বলিয়া মুখের একটি ক্লোজ-আপ ছবিও পাঠানো হইল। একটি হাস্যমুখী ছবি পাঠাইতে পারিলে ভালো হইত। তাহার হাসি সুন্দর। সে এমনিতে খুবই হাসে, শুধু ছবি তুলিবার সময় গভীর হইয়া থাকে। ইহা তাহার পুরানা অভ্যাস।

ইমরুলের আঁকা কিছু ছবি (সর্বমোট তিন) পাঠাইলাম। তিনটিই ভূতপ্রেতের ছবি। তাহার আকা একটি ল্যান্ডস্কেপ পাঠাইতে পারিলে ভালো হইত। গাছ-নদী-সূর্যস্ত-পালতোলা নৌকা টাইপ ছবি। কিন্তু ইমরুল ভূতের ছবি ছাড়া অন্য কোনো ছবি আকে না।

আপনাকে যে তিনটি ভূতের ছবি পাঠানো হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি পানিভূতের ছবি। বাকি দুইটি রাক্ষসের ছবি। ইমরুলের আঁকা প্রতিটি রাক্ষস এবং ভূতের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন, পানিভূতটির নাম— হাকু। এই ভূতের বিশেষত্ব হইল তাহার প্রধান

খাদ্য মানুষের গু। [গু শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করিবার জন্য আমি দুঃখিত। আপনার রুচিবোধকে আহত করিয়া থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।]

বিশেষ আর কী? ইমরুল বিষয়ে সমস্ত তথ্যই জানাইলাম, বাকি আপনার বিবেচনা। অতি শীঘ্র দেশে আসিয়া মাল ডেলিভারি নিয়া আমাকে দায়মুক্ত করিবেন। অধীনের ইহাই বিনীত প্রার্থনা। আল্লাহপাক আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে মঙ্গলমতো রাখুক— ইহাই তাহার দরবারে আমার ফরিয়াদ।

আসসালাম।

হিমু
প্রোপাইটার
হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড নাম্বার পেনডিং

জনাব হিমু সাহেব,

অপ্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। আপনার দীর্ঘ পত্র পেয়ে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। আপনি কুরুচিপূর্ণ আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন, আপনার হাতের লেখাও অপাঠ্য। ভবিষ্যতে ভাষা ব্যবহারে শালীন হবেন এবং যা বলতে চান সরাসরি বলবেন। দীর্ঘ পত্র পাঠের সময় আমার নেই।

যে শিশুটিকে আপনি আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তার বিষয়ে আমার এবং আমার স্বামী দুজনেরই কিছু আপত্তি আছে। যতদূর মনে হয় এই শিশুটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারব না। কারণগুলি স্পষ্ট করে বলি।

এক

শিশুর মানসিকতা সুস্থ নয়। যে শিশু ভূত-প্রেত-রাক্ষস ছাড়া অন্য কিছুর ছবি আঁকতে পারে না তার মানসিকতা অবশ্যই সুস্থ নয়। এই বিষয়ে আমরা মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর জেনিংস-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাকে ছবি তিনটিও দেখিয়েছি। উনি নিজেও বলছেন শিশু অসুস্থ পরিবেশে বড় হচ্ছে। শিশুর মনে নানান ধরনের ক্রোধ এবং ভীতির সঞ্চার হচ্ছে বলেই ছবিগুলি এমন হচ্ছে। ছবিতে গাঢ় লাল রঙের অতিরিক্ত ব্যবহারেই তিনি চিন্তিত বোধ করছেন।

দুই

আপনি লিখছেন শিশুটি সব সময় অসুখে-বিসুখে ভোগে। তার মানে শিশুটি জন্ম-রুগ্ন। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই নেই। আমরা একটি স্বাস্থ্যবান শিশু চেয়েছি। চির রুগ্ন শিশু চাই নি।

তিন

শিশুটির যে ছবি পাঠিয়েছেন তা দেখেও আমি চিন্তিত বোধ করছি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তার চোখ ছোট এবং টানা টানা। মঙ্গোলিয় বেবির লক্ষণ।

চার

ছবিতে শিশুটি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি লিখেছেন এটা তার কোনো শারীরিক ত্রুটি নয়। ছবি তোলার সময় সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে পোলিও রোগগ্রস্ত। তার একটি পা অপুষ্ট।

আমার কেন জানি ধারণা হচ্ছে। আপনার কোম্পানি আমাকে বাজে শিশু গছিয়ে বাণিজ্য করার চেষ্টা করছে। আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, বাংলাদেশের সব কোম্পানিই এই জিনিস করে। আপনি তার ব্যতিক্রম হবেন কেন?

যাই হোক, আপনি এই শিশুটি বাদ দিয়ে অন্য কিছু দেখুন। আমি ইমরুল নামের শিশুটির প্রতি আগ্রহী নই। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে আমি দেশে আসব। তখন যদি সম্ভব হয়। কয়েকটি শিশু আমাকে দেখাবার ব্যবস্থা

করবেন।

ইতি
আসমা হক
পিএইচডি

পুনশ্চ : ভবিষ্যতে আমাকে হাতে লিখে কোনো চিঠি পাঠাবেন না। কম্পিউটারে কম্পোজ করে পাঠাবেন। অবশ্যই চিঠি সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

***

মিসেস আসমা হক
পিএইচডি
জনাবা,

আপনার পত্র পাইয়া মর্মাহত হইয়াছি। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ইমরুলকে ডেলিভারির জন্যে প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আপনার পত্র পাইয়া মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি। এখন ইমরুলকে নিয়া কী করি! মিডলইস্টে উটের জকি হিসাবে প্রেরণ ছাড়া এখন আর আমার কোনো গতি নাই। কী আর করা, ইহাই ইমরুলের কপাল। এই জন্যেই পল্লীর মরমী কবি বলিয়াছেন, কপাল তোমার রঙ্গ বোঝা দায়। আপনার কপালে যে শিশু আছে আপনি তাহাকেই পাইবেন। শত চেষ্টা করিয়াও অন্য কোনো শিশুঁকে আপনার কাছে গছাইয়া দেওয়া যাইবে না। আমাদের কোম্পানি আপনার কোলে আপনার পছন্দের শিশু তুলিয়া দিবে, ইহাই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের কোম্পানির মটো

বিদেশের ঘরে ঘরে দেশের সেরা শিশু। ইহা শুধু কথার কথা নহে। ইহাই আমাদের পরিচয়।

আপনাকে আরো দীর্ঘ পত্র লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আপনি সংক্ষিপ্ত পত্র দিতে বলিয়াছেন বলিয়া এইখানেই শেষ করি।

ইতি আপনার একান্ত বাধ্যগত
হিমু

প্রোপাইটার
হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

***

হিমু,

এই ছাগলা তুই পেয়েছিস কী? আসমাকে তুই ছাইপাশ কী চিঠি লিখছিস? তোর মতলবটা কী? আমি যদি ঝাড়ুপেটা করে তোর বিষ না ঝাড়ি আমার নাম মাজেদা না।

তুই আসমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিস আসমা ফ্যাক্স করে সেসব চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছে। চিঠি পড়ে আমার আক্কেলগুড়ুম। হিমু শিশু সাপ্লাই কোম্পানি? ইয়ারকি পেয়েছিস! সবার সঙ্গে ইয়ারকি করে করে তুই যে মাথায় উঠে গেছিস এই খবর রাখিস? তুই কি ভাবিস সবাই ঘাস খায়? আসমা বেচারি তোর লক্ষণ জানে না। সে তোর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে বসে আছে। আমি যখন তাকে বললাম হিমুর প্রতিটি কথা ভুয়া। সত্যি কথা সে অতীতে কোনোদিন বলে নি। ভবিষ্যতেও বলবে না।— আসমা আমার কথা শুনে তোর উপর খুবই রাগ করেছে। সে বলছে তোকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিতে। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। তোর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় আছে তারই কখনো না কখনো মনে হবে তোকে পুলিশে দিয়ে ছেচা খাওয়াতে।

আসমা সামনের সপ্তাহে দেশে আসছে। ইমরুল না ভিমরুল কাকে যে তুই জোগাড় করে রেখেছিস তাকে দেখিয়ে দিস। পছন্দ হলে হবে, না হলে নাই। নতুন ঝামেলায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

এখন অন্য একটা জরুরি খবর তোকে দিই। তোর খালু অসুস্থ। প্রথম ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। এখন মনে হচ্ছে সিরিয়াস। গত আটদিন ধরে তোর খালু কোনো কথা বলতে পারছে না। গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হচ্ছে না। ভোকাল কর্ডে কী যেন সমস্যা হয়েছে। ইএনটির প্রফেসর নজরুল চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসায় কোনো উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত হয়তো দেশের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তোর কি পাসপোর্ট আছে? পাসপোর্ট থাকলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। তুই কোনোই কাজের না–তার পরেও তোর হলুদ পাঞ্জাবি দেখলে কেমন যেন ভরসা পাওয়া যায়।

হিমু, তুই একবার এসে তোর খালুকে দেখে যা। বেচারা খুবই মুসড়ে পড়েছে। তাকে দেখলেই এখন আমার মায়া হয়।

ইতি
তোর মাজেদা খালা

***

হিমু ভাই,

আমার সালাম নিন। ইমরুল গত তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। জ্বর একশ থেকে একশ তিনের ভেতর উঠা-নমা করছে। জ্বর যখনই বাড়ছে তখনি সে আপনাকে খুঁজছে। তার মাকে খুঁজছে না। যে ইমরুল সারাক্ষণ মা মা করে সেই ইমরুল কেন জ্বরে অস্থির হয়ে তার মাকে ডাকবে না? ঘটনাটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। বলেই আপনাকে

জানালাম। জগতের সকল ঘটনার পেছনেই কোনো না কোনো কার্যকারণ থাকে। এই ঘটনার পেছনের কারণ কী হতে পারে তা নিয়ে ভেবেছি। আমি এর পেছনে একটি কারণ বের করেছি। কারণটি সত্যি কি-না তা দয়া করে আপনি জানাবেন। কারণ এই রহস্য উদ্ধার না করতে পারলে আমি শান্তি পাব না। আমি সামান্য কারণে অস্থির হই। এখন অস্থিরতা বোধ করছি।

আমার ধারণা কোনো এক সময় ইমরুল বড় ধরনের কোনো শারীরিক কষ্টে ছিল, তখন আপনি তার কষ্ট দূর করেছেন। যে কারণে সে কোনো শারীরিক কষ্টে পড়লেই আপনার কথা মনে করে। আমি এই বিষয়ে ইমরুলের সঙ্গে কথা বলেছি। সে কিছু বলতে পারে না। আপনার কি কিছু মনে আছে? যদি মনে থাকে আমাকে জানাবেন। আমার সংশয় দূর করবেন।

ইমরুলের মাকে দেখলে এখন আপনি চমকে যাবেন। তাকে দেখলে মনে হয় তার রোগ সেরে গেছে। সে খুবই হাসিখুশি দিন কাটাচ্ছে। সাজগোজও করছে। গত পরশু আমাকে দিয়ে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি কিনে আনাল। শাড়ির সঙ্গে সবুজ টিপ। তার না-কি সবুজ কন্যা সাজার ইচ্ছা করছে। তার ছেলে অসুস্থ— এটা শোনার পরও কোনো ভাবান্তর হলো না। একবার বলল না, ইমরুলকে নিয়ে এসো আমি দেখব। এইসব লক্ষণ ভালো না। নেভার আগে প্রদীপ দপ করে জ্বলে উঠে। হিমু ভাই, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ইমরুলের মার যদি কিছু হয় আমার আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। আমি ইমরুলকে আপনার হাতে দিয়ে লাফ দিয়ে কোনো চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়ে যাব। এটা কোনো কথার কথা না। ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সাহস আমার আছে।

ইমরুলের মায়ের বিষয়ে একটি তথ্য আপনাকে জানাতে চাচ্ছি। তথ্যটি খুবই সেনসেটিভ। আমার মর্মযাতনার কারণ। ঘটনা হয়তো কিছুই না, তারপরও আমার কাছে অনেক কিছু। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি, অনেক বড় বড় ঘটনা আমি সহজভাবে নিতে পারি। কিন্তু অনেক তুচ্ছ ঘটনা সহজভাবে নিতে পারি না। হয়তো এটা আমার কোনো মানসিক ব্যাধি। এমন এক ব্যাধি যে ব্যাধির কোনো চিকিৎসা নাই।

ঘটনাটা বলি— ইমরুলের মা ফরিদা যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখন তারা থাকত ময়মনসিংহের শাওড়াপাড়া বলে একটা জায়গায়। চারতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিন তলায়। একতলায় থাকত বাড়িওয়ালা। বাড়িওয়ালার বড় ছেলের নাম হাসান। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। ছুটিছাঁটায় বাড়ি আসত। এই ছেলের হঠাৎ মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল— সে ফরিদকে বিয়ে করবে। ছেলের বাবা-মা খুবই রাগ করলেন। পড়াশোনা শেষ হয় নি, এখনই কিসের বিয়ে? কিন্তু ছেলে বিয়ে করবেই। সে পড়াশোনা ছেড়ে দিল, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল। তার মধ্যে মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। তখন সবাই ঠিক করল। বিয়ে দেয়া হবে। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক হলো। কী কারণে জানি শেষপর্যন্ত বিয়ে হয় নি। ফরিদার বাবা বদলি হয়ে ঢাকায় চলে এলেন। ছেলে চলে গেল দেশের বাইরে।

হিমু ভাই, আমার ধারণা–ঐ হারামজাদা ছেলে এখন দেশে। এবং সে রোগী দেখার নাম করে প্রায়ই ফরিদার সঙ্গে দেখা করছে। ফরিদা যে হঠাৎ সাজগোজ শুরু করেছে, সবুজ শাড়ি পরে সবুজ কন্যা সাজতে চাচ্ছে, তার মূল কারণ হয়তো এই।

হিমু ভাই, আমি অনুমান বা সন্দেহ থেকে কিছু বলছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বদমায়েশ ফরিদার সঙ্গে দেখা করছে। ফরিদাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি বলে জিজ্ঞেস করতে পারছি না, তবে ক্লিনিকের নার্সকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি— এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ফরিদার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

গত পরশু যখন ফরিদাকে দেখতে গেলাম, তখন দেখি তার মাথার কাছে এক প্যাকেট বিদেশী চকলেট। সে প্যাকেট থেকে চকলেট বের করে। বলল, নাও। চকলেট খাও। আমি বললাম, চকলেট কে দিয়েছে? ফরিদা কিছু বলল না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

হিমু ভাই, আমার মনের ভেতর কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন না। আমার আর এক ্মুহূর্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না। শুধু ইমরুলের জন্যে বেঁচে আছি। এবং প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন আমার সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়। আপনার উপর দায়িত্ব, আপনি জেনে দিন ঘটনা কী?

যে লোক চকলেট নিয়ে এসেছে সে যদি ফরিদার পুরনো প্রেমিক হয় তাহলে ঘটনা কোন দিকে যাবে তা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

এই হারামজাদা এখন বলবে। আমি ফরিদার চিকিৎসার খরচ দিব। মহৎ সাজার চেষ্টা। হিমু ভাই, এ ধরনের লোককে আমি চিনি। এই মতলববাজরা মতলব নিয়ে ঘোরে। অন্য আরেক লোকের স্ত্রী নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন? তুই মহৎ সাজতে চাস মহৎ সাজ। স্কুল দে, হাসপাতাল দে, তোকে তো কেউ মানা করছে না।

হিমু ভাই শুনুন, এই ব্যাটার টাকায় আমি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করোব না। কক্ষনো না। ফরিদা যদি চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যায় তাহলেও না। এই লোক যদি ফরিদার চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে কোনো কথা বলে তাহলে জুতিয়ে হারামজাদার আমি দাঁত ভেঙে দেব।

হিমু ভাই, উল্টাপাল্টা কীসব লিখছি আমি নিজেও জানি না। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। একটা কিছু ঘটনা আমি অবশ্যই ঘটাব। এখন আপনি এসে পুরো ঘটনার হাল ধরুন। আপনার কাছে এই আমার অনুরোধ।

মন অসম্ভব খারাপ। রাতে ঘুম হয় না। গত রাতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রামের দুটো ডরমিকাম খেয়েও সারারাত জেগে বসেছিলাম। শেষ রাতের দিকে বুকে ব্যথা শুরু হলো। সেই সঙ্গে ঘাম। হার্ট এটাক-ফেটাক হয়েছে বলে শুরুতে ভেবেছিলাম। ঐ শুয়োরের বাচ্চা সত্যি সত্যি ফরিদাকে দেখতে এসেছে–এটা জানায় আগে আমার মৃত্যু হলে ভালো হতো। তা হবে না, কারণ আমি হচ্ছি। এই পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান অভাগা।

হিমু ভাই, আপনি আমার ব্যাপারটা একটু দেখেন। ফরিদকে জিজ্ঞেস করে কায়দা করে জেনে নেন–সত্যি সত্যি সে এসেছে কি না।

ইতি হাবিবুর রহমান

পুনশ্চ-১ : হিমু ভাই, শুয়োরটার নাম রশিদুল করিম। নিউ জার্সিতে থাকে। বলে বেড়ায় কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করেছে। আমার ধারণা–সব ভুয়া। খোঁজ নিলে জানা যাবে পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ঢালে।

পুনশ্চ-২ : হিমু ভাই, আমি যে আমার সংসারের গোপন কথা আপনাকে জানিয়েছি। এটা যেন ফরিদা জানতে না পারে। আপনাকে দোহাই লাগে।

***

প্রিয় বৃষ্টি ভাইজান,

হিমু ভাই, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে? বৃষ্টি শুরু হয় শেষ রাতে। বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি আয়োজন করে বৃষ্টির শব্দ শুনি। বৃষ্টির শব্দ যে আয়োজন করে শোনা যায় এটা আমি শিখেছি আপনার কাছে। প্রথম যেদিন আপনি টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্যে আমাদের বাসায় এসেছিলেন সেদিন আপনাকে ধান্ধবাজ মানুষ মনে হয়েছিল। যখন দেখলাম। আপনি সত্যি সত্যি খুব আগ্রহ নিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছেন তখন আপনার প্রতি আমার শুরুতে যে মিথ্যা ধারণা হয়েছিল। তার জন্যে খুব লজ্জা পেয়েছি।

হিমু ভাই, আমার এখন চিঠি লেখা রোগ হয়েছে। আয়াকে দিয়ে চিঠি লেখার কাগজ-খাম আনিয়েছি। সন্ট্যাম্প আনিয়েছি। পরিচিত অপরিচিত সবার কাছে চিঠি লিখছি। আপনি শুনে খুবই অবাক হবেন যে আমি আমার স্কুলজীবনের এক বান্ধবী লুনাকেও চিঠি লিখেছি। সে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় জন্ডিস হয়ে মারা গিয়েছিল। লুনাকে লেখা চিঠিটা আমি বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি। আপনার কি ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমার ধারণা আমার মাথা ঠিকই আছে। আমার শরীর অসুস্থ কিন্তু মাথা সুস্থ।

আমি যে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে চিঠি লিখছি তার পেছনে কোনো কারণ নেই। কিন্তু আপনাকে চিঠি লেখার পেছনে কারণ আছে। আপনি দয়া করে ইমরুলের বাবাকে একটু শান্ত করবেন। সে আমার চিকিৎসার টাকা জোগাড়ের চিন্তায় আধাপাগলের মতো হয়ে আছে। আধাপাগল হলে তো লাভ হবে না। টাকা এমন জিনিস যে পাগল হলেও জোগাড় হয় না। ওর কিছু বড়লোক আত্মীয়স্বজন আছে। এক মামা আছেন কোটিপতি। আমার ধারণা সে প্রতিদিন একবার বড়লোক আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ভিক্ষুকের মতো উপস্থিত। হচ্ছে। আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে।

ওর কোটিপতি মামার বাড়িতে বিয়ের পর আমি একবার গিয়েছিলাম। সে-ই আমাকে খুব আগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা সেই বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে থাকার পর ভদ্রলোক খবর পাঠালেন। আজ তাঁর শরীর খারাপ। নিচে নামবেন না। আরেকদিন যেন যাই। সেই দিন আমি যে কষ্ট পেয়েছিলাম। এত কষ্ট কোনোদিন পাই নি। আমার ধারণা টাকার সন্ধানে গিয়ে ইমরুলের বাবা রোজ এই কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। টাকা এত বড় জিনিস আমার ধারণা ছিল না। সারাজীবন শুনে এসেছি অর্থ অনার্থের মূল। অর্থ তুচ্ছ। আজ টের পাচ্ছি। অর্থ অনেক বড় জিনিস।

হিমু ভাই, আপনি ওকে শান্ত করুন। ওর অস্থিরতা দূর করুন।

বিনীতা
ফরিদা

পুনশ্চ-১ : কামরুলের আঁকা ভূতের ছবি যেটা আপনি আমার বেডের পাশের দেয়ালে টানিয়েছেন সেই ছবি সুপার হিট করেছে। ডাক্তার নার্স যেই আসে। সেই কিছুক্ষণ ছবি দেখে। অদ্ভুত ভুত দেখে খুব মজা পায়।

৪. মাজেদা খালা দরজা খুলে

মাজেদা খালা দরজা খুলে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকলেন। ভাবটা এরকম যে আমাকে চিনতে পারছেন না। যেন আমি মানুষ না, অন্য গ্রহের কোনো প্রাণী। ফ্লাইং সসারে করে এসেছি। যান্ত্রিক গণ্ডগোলে ফ্লাইং সসার স্টার্ট নিচ্ছে না। আমি ফ্লাইং সসার। লুকিয়ে রেখে এই বাড়িতে এসেছি। খাদ্যের সন্ধানে। সপ্তাহখানিকের খাবার-দাবার নিয়ে উড়ে চলে যাব।

আমি বললাম, খালাজি সুপ্রভাত।

খালা বললেন, সুপ্রভাত মানে? তুই কী চাস? কী জন্যে এসেছিস? চাদমুখ দেখাতে এসেছিস? তোর চাদমুখ কে দেখতে চায়?

আমি বললাম, রেগে আছ কেন খালা?

রেগে থাকব না তো কী করব? তোকে কোলে করে নাচানাচি করব? আয়, কোলে আয়।

খালা সত্যি সত্যি দুহাত বাড়ালেন। তার মানে খালার রাগ এখন তুঙ্গস্পর্শী। তুঙ্গস্পর্শী রাগের বড় সুবিধা হচ্ছে–এই রাগ ঝট করে নেমে যায়। রাগ নামানোর জন্যে তেমন কিছু করতে হয় না। আপনা। আপনি নামে। সাধারণ পর্যায়ের রাগ নামতে সময় লাগে। রাগ নামানোর জন্যে কাঠ-খড়ও পোড়াতে হয়। আমি খালার রাগ নামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে না। খালার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাগ নামি নামি করছে।

খালা বললেন, তুই নিজেকে কী ভাবিস? খোলাসা করে বল তো শুনি? এক সপ্তাহ হয়েছে আসমা এসেছে। রোজ তোর খোঁজ করছে। আমি দুবেলা তোর কাছে লোক পাঠাচ্ছি। আর তুই হাওয়া হয়ে গেলি? কোথায় ছিলি?

আমি মিনমিন করে বললাম, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহিলার কাছে গিয়েছিলাম।

কী সম্পন্ন মহিলা?

আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সাইকিক। ইনি যে-কোনো মানুষের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান দেখতে পারেন। সময়ের কঠিন বন্ধন থেকে উনি মুক্ত। উনার নাম তারাবিবি। ইংরেজিতে Star Lady.

একটা থাপ্পড় যে তুই আমার কাছে খাবি!

থাপ্পড় দিতে চাইলে দাও। তবে তারাবিবির কাছে একবার তোমাকে নিয়ে যাব। উনি আবার গাছ-গাছড়ার ওষুধও দেন। কয়েকটা গাছের ছাল বাকল হামানদিস্তায় পিষে দেবেন। খাওয়ার পরে দেখবে ওজন কমতে শুরু করেছে। দৈনিক এক কেজি করে। যদি কমে তাহলে চারমাসের পর তুমি মোটামুটি একটা শেপে চলে আসবে। রিকশায় উঠতে পারবে। চাকার পাম্প চলে যাবে না।

আমাকে নিয়ে তোর এত দুশ্চিন্তা এটা তো জানতাম না?

আমি সোফায় বসলাম। খালার তুঙ্গস্পর্শী রাগ এখন সমতল ভূমিতে নেমেছে। তবে তিনি প্রাণপণে রাগ ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। তেমন লাভ হচ্ছে না। তারাবিবির বিষয়ে কৌতূহলে তাঁর চোখ চকচক করছে।

মহিলার কি নাম বললি?

তারাবিবি। The great star lady। তবে আশেপাশের সবাই তাকে মামা ডাকে।

মামা ডাকে মানে! একজন মহিলাকে মামা ডাকবে কেন?

সিস্টেম এরকম দাঁড়িয়ে গেছে। উনি যে লেভেলে চলে গেছেন সেই লেভেলে নারীপুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। উনার নিজের ছেলেমেয়েরাও উনাকে মামা ডাকে। তার স্বামী বেচারাও মামা ডাকে।

আবার তুই আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?

বিশ্বাস কর খালা, কোনো ফাজলামি না।

উনার কি সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে?

অবশ্যই আছে। ক্ষমতা না থাকলে নিজের স্বামী তাকে কোন দুঃখে মামা ডাকবে? জগতের কোনো স্ত্রী কি সহ্য করবে–স্বামী তাকে সিরিয়াসলি মামা বলে ডাকছে? তুমি সহ্য করতে? দৃশ্যটা কল্পনা কর, খালু সাহেব তোমাকে ওগো না বলে গম্ভীর গলায় মামা ডাকছেন।

ওগো সে আমাকে কখনো ডাকে না।

কী ডাকে?

কিছুই ডাকে না। হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে সারে। এখন তো ডাকাডাকি পুরোপুরি বন্ধ। গলা দিয়ে শব্দই বের হচ্ছে না।

গলা এখনো ঠিক হয় নি?

না।

চিকিৎসা চলছে না?

চলছে, তবে দেশী চিকিৎসার উপর থেকে আমার মন উঠে গেছে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মাদ্রাজ?

না জেনে কথা বলিস কেন তুই? মাদ্রাজে হয় চোখের চিকিৎসা। নেত্র হসপিটাল। আমি তোর খালুকে নিয়ে যাচ্ছি বোম্বেতে।

কথা না বলা রোগের চিকিৎসা কি বম্বেতে ভালো হয়?

তুই চুপ করে থাক। তোর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যন্ত্রণার মতো।

আমি বললাম, খালু সাহেব কথা বলতে পারছেন না–এটা তো তোমার জন্য ভালোই হলো। উনার কথা শুনলেই তো তোমার রাগ উঠে যেত। এখন নিশ্চয়ই নিমেষে নিমেষে। রাগ উঠছে না?

খালা বললেন, খামাক বকর-বকর না করে তুই চুপ করবি?

আচ্ছা চুপ করলাম।

সকালে নাশতা খেয়েছিস?

না।

এগারোটা বাজে, এখনো নাশতা খাস নি? আলসার-ফালসার বাঁধিয়ে একটা কাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত ভালো লাগে না? কী খাবি?

গোশত পরোটা। ডাবল ডিমের ওমলেট, সবজি। সবশেষে সিজনাল ফ্রুটস।

মাজেদা খালা ভয়ঙ্কর মুখ করে বললেন— তুই ভেবেছিস কী? আমার বাড়িটা ফাইভ স্টার হোটেল? গড়গড় করে মেনু দিয়ে দিলি–টেবিলে নাশতা চলে এলো।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, তাহলে এক কাজ কর— গত রাতের ফ্রিজে রেখে দেয়া ঠাণ্ডা। কড়কড়া ভাত দাও। বাসি। তরকারির ঝোল-টোল থাকলে দাও। বাসি। তরকারি মাখা কড়কড়া ভাত। খেতে খারাপ হবে না।

খালা কঠিন গলায় বললেন, চুপ করে বসে থাক। আমি নাশতা নিয়ে আসছি। একটু সময় লাগবে। খবরের কাগজ পড়। কিংবা তোর খালুর সামনে বসে থাক। সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু অন্যরা কথা বললে খুশি হয়। মাঝে মাঝে টুকটাক জবাব দেয়।

কীভাবে জবাব দেন? ইশারায়?

না। ঘরে একটা বোর্ড লাগিয়েছি। চক আছে। বোর্ডে চক দিয়ে লেখে।

আমার কথা শুনলে খুশি হবেন বলে তো মনে হয় না। আমার ছায়া দেখলেই উনি রেগে যান।

ভদ্রভাবে কথা বলবি। চেটাং চেটাং করবি না। তাহলে রাগবে না।

উনার কথা বলা বন্ধ হলো কীভাবে?

নাশতার টেবিলে বসেছে। আমি একটা ডিম পোচ করে সামনে রেখেছি। ডিম পোচটার দিকে তাকিয়ে বলল— আচ্ছা ডিম... বাকিটা বলতে পারল না। কথা গলায় আটকে গেল।

আমি খালু সাহেবকে দেখতে গেলাম।

খালু সাহেবের বয়স মনে হচ্ছে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। খাটের উপর জবুথবু বৃদ্ধ টাইপ একজন বসে আছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, উনার চেহারা আগে যেমন ছিল। এখনো তেমনি আছে। আধাপাকা চুল। চিমশে ধরনের মুখ। কপালের চামড়ায় নতুন কোনো ভাঁজ পড়ে নি। তাহলে লোকটাকে হঠাৎ এতটা বুড়ো লাগছে কেন? আমি হাসি। হাসি মুখ করে

বললাম, খালু সাহেব, ভালো আছেন? তিনি বৃদ্ধদের শুকনা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

কিছু কিছু মানুষকে রাগিয়ে দিতে ভালো লাগে। খালু সাহেব সেই কিছু কিছুদের একজন। তাঁকে রাগিয়ে দেবার জন্যেই আমি তাঁর দিকে দুপা এগিয়ে গেলাম। আমার লক্ষ্য তাঁর পাশে খাটে গিয়ে বসা। তিনি সে সুযোগ দিলেন না। মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করে আমাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। আমি যেহেতু মাছি না, সরে গেলাম না। বরং খুঁটি গেড়ে বসার মতো করে তাঁর পাশে বসলাম। তিনি ভেতরে ভেতরে কিড়ামিড় করে উঠলেন। আমি মধুর গলায় বললাম, খালু সাহেব, আমি শুনেছি আপনার সাউন্ড বক্স অফ হয়ে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। আপনি সর্বশেষ যে কথা খালার সঙ্গে বলেছিলেন সেটা নিয়ে গবেষণার মতো করছি। আপনি বলেছিলেন, আচ্ছা ডিম.। সেনটেন্স শেষ করেন নি। বাকিটা কী?

খালু সাহেব ঘোৎ করে উঠলেন। সেই ঘোৎ ভয়াবহ। সাউন্ড বক্স অফ হয়ে গেলেও ঘোৎ-ঘাৎ শব্দ ঠিকই হচ্ছে। আমি বললাম, শেষ বাক্যটা কী–আচ্ছা! ডিম পোচ কেন দিলে? অমলেট চেয়েছিলাম। না-কি অন্য কিছু?

খালু সাহেব এখন আমার দিকে অপলিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে আগুন খেলা করছে। আমি বললাম, আপনি মোটেই দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে আমার পরিচিত একজন আধ্যাত্মিক মহিলার কাছে নিয়ে যাব। তিনি সব ঠিক করে। দেবেন। ইনশাল্লাহ। আপনি আবার ফুল ভলিউমে কথা বলতে পারবেন।

তিনি আবার হাত ইশারা করে আমাকে উঠে যেতে বললেন। আমি ইশারা না বোঝার ভান করে কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

মহিলার নাম তারাবিবি, তবে সবাই তাকে মামা ডাকে। আপনাকে যা করতে হবে। তা হলো মামা মামা বলে পায়ে পড়ে যেতে হবে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হবে না। তারপরও তারাবিবি বুঝে নেবেন। অত্যন্ত ক্ষমতাধর মহিলা।

খালু সাহেব ঘো ঘোঁ জাতীয় শব্দ করলেন। আমি এই বিকট শব্দে সামান্য বিচলিত হলাম। সাউন্ড বক্স যে এতটা খারাপ হয়েছে তা বোঝা যায় নি। আমি বললাম, একটা দিন-তারিখ ঠিক করে আমাকে জানান, আমি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব। আপনার সমস্যা কী তা আগে থেকে জানিয়ে রাখলে সময় কম লাগবে।

খালু সাহেব তাড়াক করে খাট থেকে নেমে অতি দ্রুত জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। যেভাবে এগুলেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি জানালা দিয়ে লাফিয়ে দোতলা থেকে নেমে পড়তে চাইছেন। বাস্তবে দেখা গেল, জানালার পাশে লেখার বোর্ড বুলানো। বোর্ডের উপর ডাস্টার আছে। লাল-নীল মার্কার আছে। তিনি বড় বড় করে লিখলেন–

GET OUT

আমি বললাম, খালু সাহেব। আপনি রাগ করছেন কেন? আপনি অসুস্থ মানুষহঠাৎ রেগে গেলে আরো খারাপ হতে পারে।

খালু সাহেব। আবার লিখলেন–

I am saying for the last time
Get Out

আমি বললাম, ঠিক আছে এখন চলে যাচ্ছি। কিন্তু যে-কোনো একদিন এসে আপনাকে তারা মামার কাছে নিয়ে যাব। উনি খুবই পাওয়ারফুল স্পিরিচুয়েল লেডি— সাউন্ড বক্স ঠিক করা উনার কাছে কোনো ব্যাপারই না।

খালু সাহেব এবার লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লিখলেন–

SHUT UP

আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আর থাকা ঠিক হবে না। খালু সাহেব যে-কোনো মুহূর্তে ডাস্টার ছুড়ে মারতে পারেন। ডাস্টারটা তিনি একবার ডান হাত থেকে বাম হাতে নিচ্ছেন, আবার বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিচ্ছেন। লক্ষণ সুবিধার না।

নাশতার টেবিলে খালা নাশতা দিয়েছেন। গোশত, পরোটা, ভাজি, সিজনাল ফ্রুটস হিসেবে সাগর কলা। যা যা চেয়েছিলাম। সবই আছে। বাড়তি আছে সুজির হালুয়া। খালাকে খুশি করার জন্যে আমি প্রায় হামলে পড়লাম। অনেক দিনের ক্ষুধার্তা বাঘ যে ভঙ্গিতে হরিণশিশুর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সেই ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়া।

খালা স্নেহমাখা গলায় বললেন, আস্তে আস্তে খা। এমন তাড়াহুড়া করছিস কেন? খাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না। খেতে ভালো হয়েছে?

আমি বললাম, এই পরোটাকে ভালো বললে ভালোর অপমান হয়। বাংলা ভাষায় এই পরোটার গুণ বর্ণনার মতো বিশেষণ নেই। ইংরেজি ভাষায় আছে।

ইংরেজি ভাষায় কী আছে?

The grand.

তুই এমন পাম দেয়া কথা কীভাবে বলিস? জানি সবই মিথ্যা, তার পরেও শুনতে

ভালো লাগে।

খালা বসেছেন আমার সামনের টেবিলে। তাঁর চোখেমুখে আনন্দ ঝরে পড়ছে। কাউকে খাওয়াতে পারলে তার মতো সুখী হতে আমি কাউকে দেখি নি। ভিক্ষুক শ্রেণীর কাউকে যদি তিনি খেতে দেন তখনো সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখ দিয়ে স্নেহ গলে গলে পড়ে।

খালা, তুমি খালু সাহেবের চিকিৎসার কী করেছ?

এখনো কিছু করা হয় নি। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের এক ডাক্তারের সঙ্গে তোর খালু ই-মেইলে যোগাযোগ করেছেন। সামনের মাসে যাব। মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালের ঢাকা অফিস আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

সিঙ্গাপুরে যেতে চাও যাও। তার আগে মামাকে দিয়ে একটা চিকিৎসা করালে হয় না?

কোন মামা?

তারা-মামা। আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। খরচ নামমাত্র। এক ছটাক গাজা লাগবে। এক নম্বরি গাঁজার পুরিয়া। দুই নম্বরি হলে চলবে না। তিনি লাথি দিয়ে ফেলে দেবেন, তখন হিতে বিপরীত হবে। এখন তো কথা বলতে পারছেন না, তখন দেখা যাবে কানেও শুনছেন না।

ঐ মহিলা গাঁজা খায়?

আমি কখনো খেতে দেখি নি। তবে গাঁজা ছাড়া তিনি চিকিৎসা করেন না। গাঁজার পুরিয়া পায়ের কাছে রেখে তারপর কদমবুসি করতে হয়। গাঁজা ছাড়া কদমবুসি করতে গেলে গোদা পায়ের লাথি খেতে হবে।

কদমবুসি করতে হবে?

অবশ্যই।

তোর খালু কোনোদিনও ঐ মহিলার কাছে যাবে না।

ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজি করতে পোর। কিনা দেখ। এক লাখ ডলার খরচ করে বিদেশে যাবার দরকার কী? যেখানে এক ছটাক গাজায় কাজ হচ্ছে।

অসম্ভব! ওই প্রসঙ্গ বাদ দে।

আচ্ছা যাও বাদ দিলাম। তোমাদের ডলার আছে। ডলার খরচ করে চিকিৎসা করে আস।

তুই আসমার সঙ্গে কবে দেখা করবি?

যখন বলবে তখন। ঠিকানা দাও, নাশতা খেয়ে চলে যাই।

মাজেদা খালা অবাক হবার ভঙ্গি করে বললেন–তুই আসমাকে কী ভেবেছিস? সে চুনাপুটি না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সে দেখা করবে না।

বলো কী!

সোনারগাঁও হোটেলে উঠেছে। টেলিফোন নাম্বার নিয়ে যা–অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। তারপর যাবি। এক কাজ করি— আমি টেলিফোনে ধরে দেই,–তুই কথা বল।

বাংলায় কথা বলা যাবে? আমার তো আবার ইংরেজি আসে না।

রসিকতা করিস না হিমু। সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না।

খালা টেলিফোন করতে গেলেন। এই ফাঁকে খালু সাহেব একবার খাবার ঘরে উঁকি দিলেন। আমার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (বর্শা যেভাবে নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ) আবার নিজের ঘরে ঢুকে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মিসেস আসমা হক পিএইচডিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, হিমু সাহেব বলছেন?

আমি অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ইয়েস ম্যাডাম।

আপনি আজ বিকেল পাঁচটায় হোটেলে আসুন।

ইয়েস ম্যাডাম।

ঠিক পাঁচটায় আসবেন, তার আগেও না, পরেও না।

ইয়েস ম্যাডাম।

আপনার খালার কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে যে-সব তথ্য পেয়েছি তারপর আর আপনার উপর ভরসা করা যায় না। তারপরও আসুন।

ইয়েস ম্যাডাম।

কখন আসবেন বলুন তো?

বিকেলে।

বিকাল সময়টা দীর্ঘ। তিনটা থেকে বিকাল শুরু হয়, সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত থাকে। আপনাকে আসতে হবে। পাঁচটায়।

ইয়েস ম্যাডাম।

ইমরুল ছেলেটার বিষয়ে আমরা ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি। ওকে আমরা নেব না। কাজেই আপনাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। আমি এখন টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। দীর্ঘ সময় ধরে টেলিফোনে বকবক করতে আমাব ভালো লাগে না।

ম্যাডাম, একটা ছোট্ট কথা ছিল।

আবার কী কথা?

আপনার কুশল জিজ্ঞেস করা হয় নি। শরীরটা কেমন আছে?

তার মানে?

নোংরা আবহাওয়া, জীবাণুমাখা খাবার খেয়ে অসুখে পড়ে। আপনাদের সে-রকম কিছু হলো কি-না।

আপনি খুবই আপত্তিকর কথা বলছেন তা কি জানেন?

জি-না। জানি না।

আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে এই কাজটা করবেন না। মনে থাকবে?

ভদ্রমহিলা খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন। আমাকে শেষবারের মতো ইয়েস ম্যাডাম বলার সুযোগ দিলেন না।

৫. ইমরুলের সাজসজ্জা

ইমরুলের সাজসজ্জা আজ চমৎকার।

টকটকে লাল শার্ট। শার্টের চারটা বোতামের মধ্যে একটা বোতাম শুধু আছে। বাকি তিনটা মিসিং। মা হাসপাতালে, শার্টের বোতাম লাগানোর কেউ নেই। বোতাম আছে এমন শার্ট তার আছে কিন্তু ইমরুল এই শার্ট ছাড়া অন্য কোনো শার্ট পারবে না। এমনিতে সে জেদি ছেলে না। সবার কথা শোনে। কিন্তু এই শার্টটির জন্যে তার দুর্বলতা আছে। ঘরে কোনো সেফটিপিন পাওয়া গোল না। বোতামহীন ফুটোগুলি আটকানো গেল না।

শার্টের চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হলো তার একটা পায়ে শুধু জুতা। বাম পায়ে। ডান পায়ের জুতা নাকি একটা কুকুর কামড় দিয়ে নিয়ে গেছে। এক পায়ে জুতা পরেই সে বের হবে। খালি পায়ে যাবে না।

উদ্ভট পোশাকের ইমরুলকে নিয়ে আমি যথাসময়ে সোনারগাও হোটেলে উপস্থিত। হলাম। মিসেস আসমা হকের ঘরে। আদবের সঙ্গে কিলিংবেল টিপলাম। আদবের সঙ্গে কলিংবেল টেপা হলো ফুস করে একটা টিপ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। মিসেস আসমা হক দরজা খুললেন। চোখ সরু করে কিছুক্ষণ ইমরুলকে দেখলেন। রোবটদের মতো গলায় বললেন– Please Come in.

আমি বললাম, কেমন আছেন। আপা?

উনি জবাব দিলেন না। ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমার মুখে আপা ডাকটা মনে হলো তার পছন্দ হলো না। তিনি এখন তাকিয়ে আছেন ইমরুলের দিকে। ইমরুলকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি। সে গটগট করে হেঁটে বিছানার কাছে রাখা চেয়ারে উঠে বসল। হাতলে দুহাত রেখে গভীর ভঙ্গিতে পা দোলাতে শুরু করল। সোনারগাঁও হোটেলের সুইটে ঢুকলে যে-কোনো সাধারণ মানুষের আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায়। শিশুরা সাধারণ মানুষ না। অসাধারণ মানুষ। সহজে তাদের আক্কেলগুড়ুম হয় না।

মিসেস আসমা হক বললেন, আমি কি জানতে পারি। এই ছেলে কে?

আমি বললাম, এর নাম ইমরুল।

আমি এরকমই ভেবেছিলাম। ওকে নিয়ে এসেছেন কেন? আমি বলেছিলাম না। এই ছেলের ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্টেড না! ওকে কেন দেখাতে এসেছেন?

ওকে দেখাতে আনি নি। আমার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে। তারপর আপা বলুন, এতদিন পর দেশে এসে আপনার কেমন লাগছে?

আমাকে অ্যাপা ডাকবেন না।

জি আচ্ছা।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। দাঁড়িয়ে থাকব না-কি ইমরুলের মতো কোনো একটা চেয়ারে বসে পড়ব? ঘরে দ্বিতীয় যে চেয়ারটা আছে সেখানে মিসেস আসমা হক বসেছেন। বসতে হলে আমাকে বসতে হবে বিছানায়। সেটা মিসেস আসমা হক

পছন্দ করবেন না।

ছেলেটার নাম যেন কী?

ইমরুল।

ও হ্যাঁ, ইমরুল। আমার সমস্যা হচ্ছে মানুষের নাম মনে থাকে না।

ভিমরুলের কথা মনে রাখবেন। হুল ফোটায় যে ভিমরুল সেই ভিমরুল। ভিমরুল মনে থাকলে ইমরুল মনে পড়বে। এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ডস।

এর পায়ে একটা জুতা কেন?

ডান পায়ের জুতাটা কুকুর নিয়ে গেছে। মানুষের ব্যবহারী জিনিসের মধ্যে জুতা নিয়ে যায় কুকুর এবং সাবান নিয়ে যায় কাক।

আসমা হক বিরক্ত গলায় বললেন, ছেলেটাকে একটা জুতা পরে বের না করে দোকান থেকে এক জোড়া জুতা কিনে দিতেন।

আমার টাকা-পয়সার কিছু সমস্যা আছে ম্যাডাম।

মিসেস আসমা হক আরো ভুরু কুঁচকে ফেললেন। এই মহিলা মনে হয় ভুরু কুঁচকে তাকাতে পছন্দ করেন। তাঁর কপালে ভুরু কুচকানোর স্থায়ী দাগ পড়ে গেছে।

এর শার্টেরও দেখি বোতাম নেই। বোতাম আছে এমন শার্ট ছিল না? নাকি বাকি শার্টগুলিও কুকুর নিয়ে গেছে?

এইটি ইমরুলের প্রিয় শার্ট। এই শার্ট ছাড়া সে বাইরে বের হয় না।

আমার ধারণা— আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অদ্ভুত একটা পোশাক পরিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছেন। এক ধরনের শো-ডাউন। শো-ডাউন আমার পছন্দ না।

আমি বিনীত গলায় বললাম, ম্যাডাম, আমার সমস্যা হচ্ছে আমি যখন সত্যি কথা বলি তখন সবাই ভাবে মিথ্যা কথা বলছি। আবার যখন মিথ্যা বলি তখন সবাই ভাবে সত্যি বলছি। ইমরুলের পোশাকের ব্যাপারে। আমি একশ ভাগ সত্যি কথা বলছি। আমার কথা বিশ্বাস করলে সুখী হব ম্যাডাম।

আমাকে ম্যাডাম ডাকবেন না।

তাহলে ডাকব কী?

নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম আসমা। তাসমা ডাকবেন।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন?

একজন পিএইচডিকে নাম ধরে ডাকব?

পিএইচডিওয়ালাদের কি নাম থাকে না?

কাউকে নাম ধরে ডাকলে তুমি করে বলতে হয়। আপনার সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে আমাকে বলতে হবে।— আসমা তুমি কেমন আছ? সেটা কি ঠিক হবে?

আপনি দেখি অকারণে খুবই বকবক করতে পারেন। বকবকানি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ইমরুল ছেলেটা তো খুব চুপচাপ। আপনার বকবকানি স্বভাব পায় নি।

ইমরুল খোঁচার অপেক্ষা করছে। খোঁচা খেলেই বিড়বিড় করে কথা শুরু করবে,

তখন আপনার মাথা ধরে যাবে।

খোঁচার অপেক্ষা করছে মানে কী? কী খোঁচা?

কথার খোঁচা।

কিছুই বুঝতে পারছি না।— প্লিজ আপনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলুন। কথার খোঁচাটা কী?

আমি কোনো জবাব দেবার আগেই ইমরুল খিলখিল করে হেসে উঠল। আসমা বিস্মিত হয়ে বলল, এই ছেলেটা হাসছে কেন?

আমি বললাম, আপনি ইমরুলকেই জিজ্ঞেস করুন কেন হাসছে। সে কেন হাসছে। এটা তো তারই জানার কথা।

আসমা ইমরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলে, তুমি হঠাৎ হেসে উঠলে কেন ?

ইমরুল স্পষ্ট করে বলল, তুমি শুধু হাসির কথা বলে এই জন্যে আমি হাসি।

আসমাকে দেখে মনে হলো সে খুবই অবাক হয়েছে। এত সুন্দর করে গুছিয়ে বাচ্চা একটা ছেলে কথা বলবে এটা হয়তো আসমা ভাবে নি।

আমি হাসির কথা বলি?

হুঁ।

আমার কোন কথাটা হাসির?

সব কথা।

আমার সব কথা হাসিরা এই বিচ্ছ বলে কী? আমি হাসির কথা বলি— আজি পর্যন্ত কেউ আমাকে এ ধরনের কথা বলে নি। বরং বলেছে। আমি না-কি সিরিয়াস টাইপ। আমার মধ্যে কোনো ফানি বোন নেই। আমার সেন্স অব হিউমার নেই।

আমি কিছু বললাম না। লক্ষ করলাম মহিলার ভুরু সরল হয়ে এসেছে। তিনি হঠাৎ আনন্দ পেতে শুরু করেছেন। প্রাণী হিসেবে মানুষ অতি বিচিত্র। সে যখন আনন্দ পেতে শুরু করে তখন সব কিছুতেই আনন্দ পায়। তার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলেও আনন্দ পায়।

হিমু সাহেব।

জি।

বোতাম নিয়ে আসুন তো!

কী নিয়ে তাসব?

বোতাম। আমি এই ছেলের শার্টে বোতাম লাগিয়ে দেব। হোটেলে সুই সুতা থাকে। শুধু বোতাম আনলেই হবে। পারবেন না?

পারব।

আর ভিমরুলের জুতাটা খুলে নিয়ে যান। এই মাপে তার জন্যে এক জোড়া জুতা নিয়ে আসবেন। আমি টাকা দিয়ে দেব। পারবেন না?

পারব।

ভিমরুল কি এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে পারবে একা একা?

বলেই ভদ্রমহিলা ইমরুলের দিকে তাকাল।

ইমরুল গম্ভীর গলায় বলল, আমার নাম ভিমরুল না। আমার নাম ইমরুল। তুমি আমাকে ভিমরুল ডাকবে না।

সরি সরি! আর ভুল হবে না। ইমরুল তুমি কি একা একা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে পারবে?

হুঁ।

তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খাবে?

হুঁ।

দাঁড়াও, তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। আমারও ক্ষিধে পেয়েছে।

আসমা জুতা কেনার টাকা দেবার সময় গলা নামিয়ে বললেন, এই ছেলেকেই আমার পছন্দ হয়েছে। আমি একেই নেব।

আমি হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, দেরি হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে মানে? আপনি ইমরুলকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, এই জন্যে আমি আবার অন্য পার্টির সঙ্গে কথা ফাইনাল করেছি। উট পার্টি।

উট পার্টি মানে?

উটের জকি হিসেবে যারা বাচ্চা নিয়ে যায়। পার্টি হিসেবে এরা ভালো। গুড পেমেন্ট। পেমেন্টে কোনো গণ্ডগোল করে না।

আপনাকে পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেয়া যায়, এটা জানেন? আপনি বিরাট ক্রিমিন্যাল।

তা ঠিক।

আমার কাছে ক্ষমতা থাকলে প্রকাশ্য রাজপথে আপনাকে গুলি করে মারতাম। হাসছেন কেন? আমি হাসির কোনো কথা বলছি না। আই মিন ইট। যান, জুতা নিয়ে আসুন।

জুতা দেবেন। কিনা ভেবে দেখুন। ইমরুলকে তো আর আপনারা রাখতে পারছেন না। খামাখা কিছু টাকা খরচ করবেন। দেখা যাবে আপনার দেয়া জুতা পরে সে উটের পিঠে বসল।

জুতা আনতে বলছি আনুন। বোতাম আনতে আবার যেন ভুলে যাবেন না।

নতুন এক জোড়া জুতা (রঙ টকটকে লাল), শার্টের বোতাম (রঙ লাল), দুটা বিশাল বেলুন (রঙ লাল) কিনে হোটেলে ফিরে দেখি বাথটাব ভর্তি পানিতে ইমরুল ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ইমরুলের পাশে রাগত মুখে (কপট রাগ) কোমরে হাত দিয়ে আসমা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একাই কথা বলে যাচ্ছেন–

ইমরুল, দুষ্ট ছেলে, এইসব কী করছ? বাথটাবের পানি খােচ্ছ। ইমরুল, তুমি খুবই দুষ্ট ছেলে। দুষ্ট ছেলে আমি পছন্দ করি না। এরকম করলে আর কিন্তু তোমাকে বাথটাবে নামাব না। আমি খুবই রাগ করছি। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলে লাভ হবে। না। আমি হাসিতে ভোলার মানুষ না।

আমার আসল রাগ তো তুমি দেখ নি। আমাদের স্কুলের অঙ্ক টিচার মিস রিনা দাসকে পর্যন্ত একদিন ধমক দিয়েছিলাম। এমন সমস্যা হয়েছিল স্কুল থেকে আমাকে প্রায় টিসি দিয়ে দেয়। টিসি দেয়া কী জানো? টিসি দেয়া মানে বের করে দেয়া। বাথটাব থেকে তোমাকে নামিয়ে দেয়ার মতো। বুঝেছি? যেভাবে মাথা নাড়ছ তাতে মনে হচ্ছে সবই বুঝে ফেলছি।

এত জোরে মাথা নাড়বে না। শেষে মাথা ঘাড় থেকে খুলে পড়ে যাবে। তুমি হয়ে যাবে কন্ধকাটা ভূত। তুমি যে এত ভূতের ছবি আঁক কন্ধকাটা ভূতের ছবি একেছ কখনো? বাথটাব থেকে বের হয়ে আমাকে একটা কন্ধকাটা ভূতের ছবি একে দেখাবে।

শোন ইমরুল, শুধু ভূত প্রেতের ছবি আঁকলে হবে না। এখন থেকে ল্যান্ডস্কেপ আঁকবে। ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে নদী, গাছপালা, সূর্যস্ত–এইসব। বুঝতে পেরেছ? বুঝতে পেরেছ বললেই এইভাবে মাথা নাড় কেন? বললাম না। এইভাবে মাথা নাড়লে ঘাড় থেকে মাথা খুলে পড়ে যাবে। পিপি পেয়েছে। নাকি? খবরদার বাথটাবে পিপি করবে না। দাঁড়াও কমোডে বসাচ্ছি।

এক সময় গোসলপর্ব সমাধা হলো। ম্যাডাম কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে রাগারগি করলেন কারণ আমি দামি জুতা কিনি নি। আমার উচিত ছিল এডিডাস বা নাইকির জুতা কেনা। ম্যাডাম

তারপর শার্টে বোতাম লাগালেন। এই ফাঁকে হোটেলের প্যাডে ইমরুল দুটা কন্ধকাটা ভূত একে ফেলল। একটা ছেলে কন্ধকাটা, একটা মেয়ে কন্ধকাটা।

ইমরুলকে নতুন জুতা পরিয়ে নিয়ে আসব তখন একটা ছোট্ট সমস্যা হলো। ইমরুল মুখ শক্ত করে বলল, আমি যাব না।

আমি রাগী গলায় বললাম, যাবে না। মানে কী?

ইমরুল বলল, আমি আসমার সঙ্গে থাকব।

আমি ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললাম, ফাজিল ছেলের কাণ্ড দেখেছেন! চড় দিয়ে দুতিনটা দাঁত তো এক্ষুণি ফেলে দেয়া দরকার। আপনাকে নাম ধরে ডাকছে। কষে একটা চড় দিন তো। দাঁত নরম আছে। কষে চড় দিলে দাঁত পড়ে যাবার কথা।

ম্যাডাম বললেন, চড় দেবার মতো সে কিছু করে নি। শুধু শুধু চড় দেব কেন? আপনাকে আমি নাম ধরে ডাকতে বলেছিলাম। সেখান থেকে শিখেছে। ছেলেটার পিকআপ করার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি ইমরুলকে বললাম, দুষ্টছেলে, আবার যদি উনাকে আসমা ডেকেছ তাহলে তোমার খবর আছে। এখন থেকে উনাকে ডাকবে ন-মা।

আসমা বললেন, ন-মা-টা কী?

ন-মা হলো নকল মা। বাইরের যারা শুনবে তাদের কাছে মনে হবে না-মা হলো নতুন মা।

আপনার কথাবার্তা খুবই কনফিউজিং। আমি নকল মা কেন হব? আমি এই ছেলেকে নিয়ে যাব। আমি হব তার আসল মা। আমি সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব। পেটে সন্তান না নিয়েও আসল মা হওয়া যায়।

কথা বলতে বলতে আসমার গলা ভারী হয়ে গেল। তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেন এমন অবস্থা। পরিস্থিতি আরো মলিন করে তুলল। ইমরুল, সে খাটের পায়া ধরে ঝুলে পড়ল। সে কিছুতেই যাবে না। এখানেই থাকবে।

মিসেস আসমা হকের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। তার মতো মানুষ বাইরের একজন মানুষের সামনে এভাবে কাঁদবে এটা ভাবাই যায় না। এই যে তিনি চোখের পানি ফেলছেন তার জন্যে তিনি লজাও পাচ্ছেন না। আমার ধারণা তিনি বুঝতেও পারছেন না যে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

আমি বললাম, ম্যাডাম, আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।

তিনি ধরা গলায় বললেন, কী সুসংবাদ?

ইমরুলকে আপনার অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যেতে হবে না। আপনারা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাবেন তাকে ছাড়া।

এটা সুসংবাদ হলো?

হ্যাঁ, সুসংবাদ কারণ আপনাকে নামা হতে হবে না। আপনি হবেন–আমা। অর্থাৎ আসল মা। বাইরের একটা শিশুর প্রতি আপনি যে মমতা দেখিয়েছেন তার পুরস্কার হিসেবে আপনার কোলে আসবে আপনার নিজের শিশু। আপনি আমার দিকে এভাবে তাকবেন না। আমি অনেক কিছু আগে ভাগে বুঝতে পারি।

ইমরুল হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসছি। আসমা ঠিক আগের জায়গায় বসে আছেন। তার চোখে এখন কোনো পানি নেই। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তার চোখ দিয়ে অশ্রুবন্যা বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু অশ্রু আছে চোখে দেখা যায় না।

হিমু সাহেব!

জি।

আপনি কি ইমরুলকে নিয়ে যাচ্ছেন?

নিয়ে যাওয়াটাই কি ভালো না? ইমরুলের প্রতি মমতা দেখানোর আপনার আর কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের জিনিস আসছে।

দয়া করে আপনি আমাকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখাবেন না। কোনটা হবার কোনটা হবার না তা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ইমরুলকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন নিয়ে যানএকটা ছোট্ট কাজ কি করতে পারবেন। রাত দশটার দিয়ে টেলিফোন করতে পারবেন?

অবশ্যই পারব। কেন বলুন তো?

ইমরুল কান্না থামিয়ে শান্ত হয়েছে কি হয় নি এটা জানার জন্যে।

আমি টেলিফোন করে আপনাকে জানাব।

ভুলে যাবেন না কিন্তু।

আমি ভুলে যাব না।

রাত দশটার দিকে টেলিফোন করার কথা, আমি কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় টেলিফোন করলাম। একজন পুরুষমানুষ টেলিফোন ধরলেন এবং গঞ্জীর গভীর বললেন–আপনি কি হিমু?

আমি বললাম, জি।

আমার নাম ফজলুল আলম। আমি...

পরিচয় দিতে হবে না। আপনি কে বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক কাঁটা কাঁটা গলায় বললেন, আমি বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আর কখনোই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না। তাঁকে বিরক্ত করবেন না। আপনি মানসিকভাবে তাঁকে পঙ্গু করে ফেলেছেন। ভদ্রলোক খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

৬. হাবিবুর রহমান সাহেবের ব্রেইন

হাবিবুর রহমান সাহেবের ব্রেইন যে একেবারেই কাজ করছে না তা তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি এলোমেলো। তিনি স্থির হয়ে তাকাতে পারছেন না। মানুষের মন যেমন ছটফট করে, চোখও করে। মনের ছটফটানি ধরার কোনো উপায় নেই। চোখেরটা ধরা যায়।

আমি বললাম, কেমন আছেন?

হাবিবুর রহমান চমকে উঠলেন। তার ভাব দেখে মনে হবে। আশেপাশে কোথাও ককটেল ফুটেছে। তিনি বললেন, কিছু বলেছেন?

আমি বললাম, চমকে উঠার মতো কিছু বলি নি। জানতে চাচ্ছিলাম কেমন আছেন?

ভালো।

আপনার কি শরীর খারাপ না-কি?

জানি না।

কোনো কারণে কি মন অশান্ত?

জি-না, আমি ভালো আছি।

বলেই তিনি পুরোপুরি ঝিম মেরে গেলেন। এতক্ষণ তিনি চাঃেখের দৃষ্টি স্থির করতে পারছিলেন না। এখন তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। তাঁকে এখন দেখাচ্ছে ধ্যানমগ্ন মানুষের মতো। আমি বললাম, রাশিদুল করিম নামের হারামজাদাটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হাবিবুর রহমান হতভম্ব গলায় বললেন, কীভাবে বুঝলেন?

আপনি থ মেরে গেছেন। সেখান থেকে অনুমান করছি। দুয়ে দুয়ে চার মেলাচ্ছি।

হাবিবুর রহমান বললেন, কুত্তাটার সাহস দেখে অবাক হয়েছি। বাসায় চলে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সুটি টাই মচমচা জুতা। সেন্ট মেখেছে। গা দিয়ে। ভুরিভুর করে গন্ধ বের হচ্ছিল। পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে চেয়েছিলাম।

দিলেন না কেন?

এখন তাই চিন্তা করছি। কেন দিলাম না! মানুষ কুকুরের গায়ে গরম মাড় ঢেলে দেয়। আমার উচিত ছিল কুকুরটার গায়ে গরম মাড় ঢেলে দেয়া। আফসোস হচ্ছে কেন মাড় ঢেলে দিলাম না!

ঘরে বোধহয় মাড় ছিল না।

হাবিবুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, ঠাট্টা করছেন? আমার এই অবস্থায় আপনি ঠাট্টা করতে পারছেন। আপনি এতটা হাটলেস?

আমি বললাম, আপনার কাছে এসেছিল কী জন্যে? সে কী চায়?

হাবিবুর রহমান থমথমে গলায় বললেন, মহৎ সাজতে চায়। ফরিদার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ দিতে চায়। শুয়োরটার সাহস কতা! বলে কী প্রয়োজনে সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক নিয়ে যাব। আরে কুত্তা, তোর সিঙ্গাপুর-ব্যাংকককে আমি পেসাব করে দেই।

বলেছেন এই কথা?

না। বলা উচিত ছিল। যা যা করা উচিত ছিল তার কিছুই আমি করি নি। এখন রাগে আমার ইচ্ছা করছে নিজের হাত নিজে কামড়াই। গতকাল রাতে আমি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারি নাই। দুটা ফ্রিজিয়াম খেয়েছি, তারপরেও ঘুম আসে না। হিমু ভাই, আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি উল্টা ঐ কুত্তাটার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলেছি।

চা বানিয়েও তো খাইয়েছেন।

আপনাকে কে বলল?

আমি অনুমান করছি।

হ্যাঁ, কুত্তাটাকে চা বানিয়ে খাইয়েছি। কুত্তাটা আমার সামনে বসে চুকচুক করে চা

খেয়েছে।

শুধু চা? নাকি চানাচুর-টানাচুর কিছু ছিল?

শুধু চা।

চিকিৎসার ব্যাপারে কী বলেছেন?

বলেছি আমি আমার যা সাধ্য করব। কারোর কোনো দান নেব না।

এইটুকুই বলেছেন? আর কিছু বলেন নি?

না, এইটুকুই বলেছি। তবে শক্তভাবে বলেছি। আমার বলার মধ্যে কোনো ধানাইপানাই ছিল না। ভালো বলছি না?

অবশ্যই ভালো বলেছেন। তবে এই সঙ্গে আরো দুএকটা কথা যুক্ত করে দিলে আরো বালো হতো।

কী কথা?

আপনার বলা উচিত ছিল–এই কুত্তা, তুই খবরদার আমার স্ত্রীকে দেখতে যাবি না। আমার স্ত্রী তোর লাইলী না। আর তুইও মজনু না। তোকে যদি হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখি তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব। টান দিয়ে তোর বাঁকা ল্যাজ সোজা করে দেব। বাকি জীবন সোজা লেজ নিয়ে হাটবি। কুকুর সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবি না।

হাবিবুর রহমান আহত গলায় বললেন, হিমু ভাই, আপনি তো হৃদয়হীন একজন মানুষ। আমার এমন অবস্থায় আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা করছি কেন বলছেন?

অবশ্যই ঠাট্টা করছেন। আপনি বলছেন টেনে লেজ সোজা করে দেবেন। সোজা লেজ নিয়ে সে কুকুর সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। এগুলো ঠাট্টার কথা না? আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলে রসিকতা করতেন না।

মনের অবস্থা কি খুবই খারাপ?

আমি চার পাতা ফ্রিজিয়াম কিনেছি। এক এক পাতায় আটটা করে মোট বত্রিশটা ফ্রিজিয়াম। কাল রাতে ভেবেছিলাম। সবগুলো খাব।

খেলেন না কেন?

ইমরুল আমার সঙ্গে থাকে। সে ভোরবেলা জেগে উঠে দেখবে একটা মারা মানুষকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। প্রচণ্ড ভয় পাবে এই জন্যে খাই নি।

আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম, আজ রাতে যদি এ ধরনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে আমি বরং ইমরুলকে নিয়ে যাই।

হাবিবুর রহমান জবাব দিলেন না। মানসিক রোগীদের মতো অস্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, ইমরুলকে নিয়ে যা েব কি-না বলুন। বত্রিশটা ট্যাবলেটের ভেতরে দুটা মাত্র খেয়েছেন। আরো ত্রিশটা আছে। এই ত্রিশটায় কাজ হয়ে যাবার কথা।

আপনি আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলছেন?

হুঁ।

কেন বলছেন? যাতে আমার মৃত্যুর পর ঐ কুত্তাটা ফরিদাকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করতে পারে।

সেই সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা-না। আপনার তো আপনার স্ত্রীর জন্যে কোনো প্রেম নেই। ঐ ভদ্রলোকের আছে। সবাই চায় প্রেমের জয় হোক।

আমার স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো প্রেম নেই?

না।

কী করে বুঝলেন? আমার কপালে লেখা আছে?

কপালে লেখা থাকে না। প্রেম আছে কি নেই তা লেখা থাকে চোখে। আপনার দুটা চোখেই লেখা–প্রেম নেই।

আপনি কি চোখের ডাক্তার?

চোখের ডাক্তার চোখের লেখা পড়তে পারে না।

হাবিবুর রহমান ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, আপনি মহা তালেবার। আপনি চোখের লেখা পড়তে শিখে গেছেন?

তা শিখেছি। অবশ্যি চোখের লেখা যে পড়তে পারে না তার পক্ষেও বলা সম্ভব যে আপনার মধ্যে আপনার স্ত্রীর প্রতি কোনো প্রেম নেই।

তাই?

জি। প্রেম থাকলে আপনার একমাত্র চিন্তা থাকত আপনার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করা। তার চিকিৎসার টাকা কে দিল সেটা হতো তুচ্ছ ব্যাপার। রশীদ সাহেবের টাকা নিতে আপনার অহঙ্কারে বাঁধছে। প্রেমিকের কোনো অহঙ্কার থাকে না।

যথেষ্ট বকবক করেছেন। দয়া করে মুখ বন্ধ করুন।

জি আচ্ছা। মুখ বন্ধ করলাম।

আমার সামনে বসে থাকবেন না। এই মুহূর্তে বের হয়ে যান।

যাচ্ছি।

Go to hell.

মৃত্যুর পর চেষ্টা করে দেখব–Hell এ যেতে পারি কি-না। আপাতত গুলিস্তানের দিকে যাই। ভালো কথা ইমরুলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আজ রাতে যদি ঘুমের ওষুধ ইস্তেমাল করতে চান তাহলে আপনার সুবিধা হবে। পথ খোলা থাকল।

আর কোনো কথা না। অনেক কথা বলে ফেলেছেন।

আমি বললাম, শেষ কথা বলে যাই, উত্তেজিত অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাবেন না। বমি হয়ে যাবে। খালি পেটেও খাবেন না। খালি পেটে ঘুমের ওষুধ খেলেও বমি হয়। হালকা ম্যাকস জাতীয় কিছু খেয়ে নেবেন। সব ট্যাবলেট খাওয়ার পর গরম কফি খেতে পারেন। এতে Action ভালো হয়।

Get Out

আমি ইমরুলকে নিয়ে গেট আউট হয়ে গেলাম। হাবিবুর রহমান সাহেব ঘুমের ওষুধ খাবেন কি-না বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা না। ফিফটি ফিফটি চান্স। মজার ব্যাপার হলো মানব জীবনের সব সম্ভাবনাই ফিফটি ফিফটি। বিয়ে করে সুখী হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

ফিফটি ফিফটি চান্স।

বড় ছেলেটি মানুষ হবে সেই সম্ভাবনা কত পারসেন্ট?

ফিফটি পারসেন্ট।

ইমরুলকে নিয়ে রিকশায় চড়েছি। সে খুবই আনন্দিত। আমি বললাম, কেমন আছিসরে ব্যাটা?

ভালো।

কতটুকু ভালো আছিস হাত মেলে দেখা।

সে হাত মেলছে। মেলেই যাচ্ছে...

বুঝতে পেরেছি। খুব ভালো আছিস। দেখি এখন একটা গান শোনা ভালোবাসার গান। ভালোবাসার গান জনিস?

জানি।

ইমরুল তৎক্ষণাৎ গান ধরল–

তুমি ভালোবাস কিনা
আমি তা জানি না...

ভালোবাসার গান ইমরুল এই দুই লাইনই জানে। শিশুদের নিজস্ব বিচিত্র সুরে সে এই গান করছে। রিকশাওয়ালা গান শুনে খুব খুশি। সে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে বলল— মাশাল্লাহ, এই বিচ্ছু দেহি বিরাট গাতক।

আমি বললাম, এই বিচ্ছ, বল দেখি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ইমরুল বলল, জানি না।

বিশেষ কোথাও যেতে ইচ্ছা করে?

ইমরুল বলল, না।

মাকে দেখতে যাবি?

না।

আসমা হক নামের একজন মহিলা ছিলেন যিনি তোকে নতুন জুতা কিনে দিয়েছেন, তার কাছে যাবি?

না।

রিকশায় চড়তে আমার সব সময়ই ভালো লাগে। আজ যেন একটু বেশি ভালো লাগছে। শুনছি। ঢাকা শহর রিকশামুক্ত হবে। আমরা পুরোপুরি মেট্রোপলিটন সিটির যুগে প্রবেশ করব। শনশন করে গাড়ি চলবে। আধুনিক গতির যুগ। শনশন ঝনঝন।

উল্টোটা হলে কেমন হতো। কেউ যদি এমন ব্যবস্থা করতেন যেন এ শহরে কোনো গাড়ি না চলে। শুধু রিকশা এবং সাইকেল চলবে। কোনো গাড়ি থাকবে না। পৃথিবীর একমাত্র নগরী যেখানে কোনো গাড়ি নেই। রাস্তায় কুৎসিত হর্ন বাজবে না। জলতরঙ্গের মতো টুনটুন করে রিকশার ঘন্টি বাজবে। নগরীতে কোনো কালো ধোয়া থাকবে না। পর্যটনের বিজ্ঞাপনে লেখা হবে–

DHAKA
CITY OF RICKSHAW

প্রতিটি রিকশার পেছনে বাধ্যতামূলকভাবে চিত্রকর্ম থাকতে হবে। ভ্রাম্যমাণ চিত্রশালা। আমরা পেইনটিং দেখতে দেখতে রিকশায় চড়ে ঘুরব। মন্ত্রীদের জন্যে থাকবে। ফ্ল্যাগ বসানো রিকশা। প্রধানমন্ত্রীও রিকশায় করেই যাবেন। তার আগে পেছনে থাকবে সাইকেল আরোহী নিরাপত্তা-কমীরা। রিকশার কারণে গতির দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাব। সবদিক দিয়েই তো পিছিয়ে পড়ছি। গতির দিকে পিছিয়ে পড়লে ক্ষতি কী?

ইমরুল বলল, পিপি করব।

আমাদের রিকশা রাস্তার মাঝামাঝিতে। জামে জট খেয়ে গেছে। জটি খুলবে। এমন সম্ভাবনা নেই। বাধ্য হয়েই ইমরুলকে রিকশার পাটাতনে দাঁড় করিয়ে প্যান্টের জিপার খুলে দিলাম। সে মহানন্দে তার কর্মকরছে। আশপাশের সবাই মজা পাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দেখছে। একজন আবার গাড়ির কাচ নামিয়ে ফাট করে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলল। ছবিটা ভালো হবার কথা। সুন্দর কম্পোজিশন।

ইমরুল বলল, আমি ছান্তা খাব।

ছান্তা হলো ফান্টা। সে বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে বলতে পারে, তারপরও কিছু কিছু অদ্ভুত শব্দ সে তার ঝুলিতে রেখে দিয়েছে। ফান্টাকে বলবে ছান্তা। গাড়িকে বলবে রিরি। শিশুদের মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে। প্রথম শৈশবের কিছু শব্দ সে অনেকদিন ধরে রাখে। একদিন হঠাৎ সে এই শব্দগুলি ছেড়ে দেয়। আর কোনোদিন ভুলেও উচ্চারণ করে না। যে বিশেষ দিনে এই ঘটনাটি ঘটে। সেই বিশেষ দিনেই তার শৈশবের সমাপ্তি।

ইমরুলকে ছান্তিা খাইয়ে আমি মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। তিনি টেলিফোনে আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন–তুই কোথায়?

আমি চমকে উঠে বললাম, আবার কী হয়েছে?

তুই ডুব মেরে কোথায় ছিলি? আমি কম করে হলেও দশ হাজারবার তোর খোঁজে লোক পাঠিয়েছি।

গুরুতর কিছু কি ঘটেছে খালা? খালু সাহেবের জবান খুলেছে? উনি কথা বলা শুরু করেছেন?

ও যেমন ছিল তেমন আছে। তোকে খুঁজছি। অন্য কারণে। আসমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে।

কেন?

তুই একবার ইমরুলকে দেখিয়ে এনেছিস, তারপর আর তোর কোন খোঁজ নেই। বেচারি ছেলেটার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।

টাকা-পয়সা ক্লিয়ার করে মাল ডেলিভারি নিয়ে যাক। মাল আমার সঙ্গেই আছে।

হিমু শোন, এ ধরনের ফাজলামি কথা তুই আর কোনদিন বলবি না। কোনোদিন না।

আচ্ছা, বলব না।

ছেলেটাকে তুই এক্ষুণি ওদের কাছে দিয়ে আয়। এই মুহূর্তে।

এই মুহূর্তে ডেলিভারি দিতে পারব না।

কেন? শেষ সময়ে বাবা-মা ঝামেলা করছে? জানি এরকম কিছু হবে। শেষ মুহূর্তে দরদ উথলে উঠবে।

এই মুহূর্তে ডেলিভারি দিতে পারছি না, কারণ মিসেস আসমা হকের স্বামী আমাকে বলেছেন, তাঁর স্ত্রীর ত্রিসীমানায় যেন আমি না থাকি। তাঁর সঙ্গে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত মাল ডেলিভারি হবে না।

বলিস কী! আসিমার স্বামী বিগড়ে গেল কেন? আসমা তো আমাকে কিছু বলে নি।

এখন আমি কী করব বলো।

আসমা ইমরুলকে দেখতে চাচ্ছে। তুই আসমার কাছে ওকে দিয়ে কেটে পড়।

ঠিক আছে তাই করছি। তুমি খালু সাহেবের ব্যাপারে কী করলে?

ভিসা নিয়ে কী যেন ঝামেলা হচ্ছে। ভিসা পেলেই চলে যাবে।

জবান এখনো বন্ধ?

হ্যাঁ।

মহিলা পীরের চিকিৎসাটা করাবে না?

মহিলা পীরের কোন চিকিৎসা?

বলেছিলাম না তোমাকে–প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সঞ্চয় করা পীরনি। সবাই যাকে মামা ডাকে। উনার পায়ে পড়লেই...।

ভুলে যা। তোর খালু যাবে মামা ডাকতে!

খালু সাহেবের তো জবানই বন্ধ। আমি উনার হয়ে মামা ডাকব। উনার হাসবেন্ডকে ডাকব মামি।

তার হাসবেন্ডকে মামি ডাকতে হয়?

মহিলাকে যখন মামা ডাকতে হয়। পুরুষকে মামি ডাকতে হবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

খামাকা বকবক করবি না। সকালবেলা বকবকানি শুনতে ভালো লাগে না।

টেলিফোন রেখে দেব?

না, রেখে দিবি না। কানে ঝুলিয়ে বসে থাক। গাধা কোথাকার। টেলিফোন রেখে এক্ষুণি ঐ ছেলেকে আসমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার এইখানে আয়।

আচ্ছা, আসব।

আমার বাড়িতে এখন নতুন নিয়ম— বাসায় ঢুকে কোনো কথা বলতে পারবি না। ফিসফিস করেও না।

কেন?

তোর খালু কথা বলতে পারে না তো, এই জন্যে কাউকে কথা বলতে শুনলে রেগে যায়। ভয়ঙ্কর রাগে। এই জন্যেই বাড়িতে কথা বলা বন্ধ।

ভালো যন্ত্রণা তো!

মহা যন্ত্রণা। এই যে তোর সঙ্গে কথা বলছি, কর্ডলেস নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছি। কথাও বলছি ফিসফিস করে। বুঝলি হিমু— মাসখানিক এই অবস্থা চললে দেখবি আমিও কথা বলা ভুলে গেছি। ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ করছি। খুবই খারাপ অবস্থায় আছি রে হিমু!

এই বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না। আমি ভুজুং ভাজুং দিয়ে খালু সাহেবকে চিকিৎসা করিয়ে আনিব। মামা-চিকিৎসা।

তুই কখন আসবি?

দুএকদিনের মধ্যে চলে আসব।

দুএকদিন না, এক্ষুণি আয়।

দেখি।

কোনো দেখাদেখি না। লাফ দিয়ে কোনো বেবিটেক্সিতে উঠে পড়।

আমি খালার কথামতোই কাজ করলাম। ইমরুলকে মিসেস আসমা হকের দরবারে পৌঁছে দিয়ে লাফ দিয়ে একটা বেবিটেক্সিতে উঠে পড়লাম। তবে আমার গন্তব্য খালু সাহেবের বাড়ি না— হাসপাতাল। ফরিদা কী করছে না করছে এই খোঁজ নেয়া। হাসপাতালে কী ড্রামা হচ্ছে কে জানে! থানা এবং হাসপাতালে মানব জীবনের সবচে বড় ড্রামাগুলি হয়। দর্শক হিসেবে অসাধারণ নাটক দেখতে হলে এই দুজায়গায় হঠাৎ হঠাৎ উপস্থিত হতে হয়। চমৎকার কিছু দৃশ্য হলো, মনে মনে হাততালি দিয়ে ফিরে চলে আসা। আবার নাটক দেখতে ইচ্ছা হলে আবার চলে যাওয়া। আমার (মহানা) বাবা তাঁর মহাপুরুষ বানানোর শিক্ষা প্রণালিতে পরিষ্কার করে লিখেছেন–

মৃত্যুপোঠযাত্রী কখনো দেখিয়াছ? কখনো কি তাহার শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাপন করিয়াছ? কখনো কি দেখিয়াছ কী রূপে ছটফট করিতে করিতে জীবনের ইতি হয়। জীবনের প্রতি মানুষের কী বিপুল তৃষ্ণা। আর কিছুই চাই না— শুধু বঁচিবার জন্যেই বাঁচিতে চাই।

বাবা হিমালয়, তুমি অবশ্যই তোমার জীবনের কিছু সময় মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্যে আলাদা করিয়া রাখিবে। তাহাদের শয্যাপার্শ্বে রাত্রি যাপন করিবে। যে হাহাকার নিয়া তাহারা যাত্রা করিতেছে সেই হাহাকার অনুভব করার চেষ্টা করিবে।

বাবা সামান্য ভুল করেছেন। তিনি ভুলে গেছেন সব মানুষই মৃত্যুপথযাত্রী। যে শিশুটি হেসে খেলে ছুটে বেড়াচ্ছে সেও মৃত্যুপথযাত্রী। তার চোখের দিকে তাকালেও জীবনের প্রতি মানুষের বিপুল তৃষ্ণার খবর পাওয়া যায়। এই খবর জানার জন্যে হাসপাতালে বসে থাকার প্রয়োজন নেই।

ফরিদার বিছানার পাশে সোনালি চশমা পরা যে যুবকটি বসে আছে তার নামই বোধহয় রাশেদুল করিম। সাদা ফুলপ্যান্টের সঙ্গে আকাশি নীল রঙের হাওয়াই শার্ট পরেছে বলেই পোশাকটা ইউনিফর্মের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। শুধু চেহারা দেখে প্রেমে পড়ার বিধান থাকলে সব মেয়েই এই ছেলের প্রেমে পড়ত। তারা দুজন মনে হয় মজার কোনো কথা বলছিল। দুজনের মুখই হাসি হাসি। আমাকে দেখে রাশেদুল করিমের মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ফরিদা কিন্তু হাসতেই থাকল। মেয়েদের এই ব্যাপারটা আছে। কোনো রসিকতা তাদের মনে ধরে গেলে তারা অনেকক্ষণ ধরে হাসে।

রাশেদুল করিম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষের মতো বললেন, হিমুভাই, কেমন আছেন? বলেই হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ালেন।

আমি এখন মজার একটা খেলা খেলতে পারি। রাশেদুল করিমের হাত অগ্রাহ্য করে তাকে খুবই বিব্রত অবস্থায় ফেলতে পারি। বিব্রত অবস্থায় সে কী করে এটাই তার আসল চরিত্র।

আমি রাশেদুল করিমের দিকে তাকালাম। তাঁর বাড়িয়ে দেয়া হাতের দিকে তাকলাম। নিজে হাত বাড়ালাম না। ভদ্রলোক হাত নামিয়ে নিলেন এবং হেসে ফেললেন। আবারো বললেন, হিমুভাই, কেমন আছেন?

ভালো।

আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে না দেখে যদি আপনার ছায়া দেখতাম তাহলেও বলে ফেলতে পারতাম— এই ছায়া হিমু সাহেবের।

ছায়া দেখে চিনতে পারতেন না। সব মানুষ আলাদা কিন্তু তাদের ছায়া একরকম।

এটা কি কোনো ফিলসফির কথা?

অতি জটিল ফিলসফির কথা। অবসর সময়ে এই ফিলসফি নিয়ে চিন্তা করবেন। কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন।

ফরিদার মাথায় এখনো বোধহয় রসিকতাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে হেসেই যাচ্ছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে হাসি সামলাবার চেষ্টা করল। রোগ যন্ত্রণায় কাতর রোগীর আনন্দময় হাসির চেয়ে সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না। আমি মুগ্ধ হয়ে হাসি দেখছি। রাশেদুল করিম বললেন, হিমুভাই, আপনি কি দয়া করে ফরিদকে একটু বুঝবেন? আমি নিশ্চিত সে আপনার কথা শুনবে।

কোন বিষয়ে বুঝাতে হবে?

চিকিৎসার জন্যে আমি তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে চাই। সে যাবে না। হিমুভাই প্লিজ, আপনি তাকে রাজি করিয়ে দিন। যদি আপনি এটা করে দিতে পারেন তাহলে বাকি জীবন

আমি আপনার মতো হলুদ পাঞ্জাবি পরে কাটাব। পায়ে জুতাস্যান্ডেল কিছুই থাকবে না। প্লিজ প্লিজ।

ফরিদা আমাদের কথা শুনছে। কিন্তু তার মুখের হাসি যাচ্ছে না। আমি তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ফরিদা বলল, হিমুভাই, গত রাতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। মানুষ কখনো হাসির কোনো ঘটনা স্বপ্নে দেখে না। আমি এমন একটা হাসির স্বপ্ন দেখেছি যে হাসতে হাসতে আমার ঘুম ভেঙেছে। যতবারই আমার স্বপ্নের কথাটা মনে হচ্ছে ততবারই আমি হাসছি।

স্বপ্নটা কী?

স্বপ্নটা কী আমি বলব। তার আগে চেয়ারটায় আপনি বসুন। আসল কথাটা মন দিয়ে শুনুন।

তাসল কথাটা কী?

ফরিদা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আমি অন্যের টাকায় চিকিৎসা করাব না। ইমরুলের বাবা মনে কষ্ট পাবে। এই কষ্ট আমি তাকে দেব না।

তুমি মরে গেলে ইমরুলের বাবা কষ্ট পাবে না?

পাবে। দুটা কষ্ট দুরকম।

রাশেদুল করিম সাহেবের টাকায় তুমি চিকিৎসা করাবে না?

না।

তোমার মৃত্যুর মাস ছয়েকের মধ্যে ইমরুলের বাবা আরেকটা বিয়ে করবে, তারপরেও না?

না।

সৎমা ইমরুলকে নানানভাবে কষ্ট দেবে, তারপরেও না?

না।

তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছ— স্বামীর প্রতি তোমার গভীর প্রেম?

আমি কোনো কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। আমি ইমরুলের বাবার মনে কষ্ট দিতে চাচ্ছি না।

ঠিক আছে, মামলা ডিসমিস।

আমি রাশেদুল করিমের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ শুকনা হয়ে গেছে। সে তাকিয়ে আছে হতাশ চোখে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। হাসপাতালের কেবিন ঘরে একটাই চেয়ার। সেই চেয়ার আমি দখল করে আছি। তাকে বসতে হলে ফরিদার পাশে খাটে বসতে হয়। এই কাজটা সে করতে পারছে না। আবার সে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না। সে ফরিদার দিকে তাকিয়ে বলল, ফরিদা আমি চলে যাই। ফরিদা বলল, আচ্ছা। তারপরেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত আশা করল। ফরিদা তাকে আরো কিছু বলবে। ফরিদা

কিছুই বলল না। কঠিন চোখে কেবিন ঘরের ধবধবে সাদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরে আমি এবং ফরিদা। রাশেদুল করিম চলে গিয়েছে। ফরিদার মুখে আগের কাঠিন্য নেই। কিছুক্ষণ আগে নার্স এসে একগাদা ওষুধ খাইয়ে গেছে। নার্সের সঙ্গে সে হেসে হেসে কথা বলেছে। সেই হাসির রেশ এখনো ঠোঁটের কোনায় ধরা আছে।

হিমুভাই।

বলো।

আপনি একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে চাই বলেই কি বিদেশে যেতে চাচ্ছি না? আমি এখন প্রশ্নটার জবাব দেব। জবাব শুনে আপনি চমকে যাবেন।

জবাবটা কী?

ফরিদা বলল, ওর প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। কখনো ছিল না।... আপনি আমার কথা শুনে খুবই চমকে গেছেন। তাই না হিমুভাই?

আমি সহজে চমকাই না।

তারপরেও আপনি চমকে গেছেন। আমি আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। হিমুভাই শুনুন, যাকে একটু আগে আপনি দেখেছেন, কিশোরী বয়সে তার প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েরা যে কত আবেগ নিয়ে ভালোবাসতে পারে তা আপনারা পুরুষরা কখনো বুঝতে পারবেন না।

পুরুষরা ভালোবাসতে পারে না?

না। আর পারলেও তার মাত্রা অনেক নিচে। পুরুষের হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা। মেয়েদের ব্যাপার অন্যরকম, তাদের কাছে ভালোবাসার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক নেই। একটা মেয়ে যখন ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার সঙ্গে অনেক স্বপ্ন যুক্ত হয়ে যায়। সংসারের স্বপ্ন। সংসারের সঙ্গে শিশুর স্বপ্ন। একটা পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন সে শুধু তার প্রেমিকাকেই দেখে। প্রেমিকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি শিশুর স্বপ্ন দেখে না।

তুমি নিজে এইসব ভেবে ভেবে বের করেছ?

জি, আমার তো শুধু শুয়ে থাকা। হাসপাতালের বিছানায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুয়ে শুয়ে আমি শুধু ভাবি। ভেবে ভেবে অনেক কিছু বের করে ফেলেছি।

ভালো তো। অনেক জ্ঞান পেয়ে গেলে।

জ্ঞান পেয়ে হবে কী? আমি তো মরেই যাচ্ছি।

আইনস্টাইনও অনেক জ্ঞান পেয়েছিলেন। তিনিও কিন্তু তার জ্ঞান নিয়ে মরে গেছেন।

হিমুভাই প্লিজ, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না। এক সময় আমি তর্ক করতে খুব ভালোবাসতাম। এখন তর্ক করতে ভালো লাগে না। কেউ তর্ক করতে এলে আগেভাগে হার মেনে নেই। শুরুতেই বলে দেই— তাল গাছ আমার না। তাল গাছ তোমার। এখন তর্ক বন্ধ কর।

তোমার সঙ্গে হাসপাতালে নিশ্চয়ই কেউ তর্ক করতে আসে না।

আসবে না কেন? আসে। আপনিও তো কিছুক্ষণ তর্ক করেছেন। করেন নি?

আমার বেলায় তুমি কিন্তু বলো নি যে তালগাছ আপনার।

প্লিজ হিমুভাই, চুপ করুন তো।

চুপ করলাম। আমি কি চলে যাব?

না, আপনি চলে যাবেন না। আমার ব্যাপারটা আমি আপনাকে বলব। আমি তো মরেই যাচ্ছি। মরার আগে গোপন কথাটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা! করছে।

লাভ কী?

জানি না লাভ কী, আমার বলতে ইচ্ছা করছে। আমি বলব।

বেশ বলো।

ফরিদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমার দম ফুরিয়ে গেছে। আমি একটু দম নিয়ে নেই। আমি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। আপনি কিন্তু চলে যাবেন না।

আমি চলে গেলাম না।

ফরিদা চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি বসে আছি তার পাশে। তাকিয়ে আছি। একটি ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে। দেখেই মনে হচ্ছে ফরিদা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের লাশকাটা ঘরের ঘুম—

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার যুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

ফরিদা টানা দুঘণ্টা ঘুমুল। সময়টা আন্দাজ করে বলছি। আমার হাতে ঘড়ি নেই। হাসপাতালের এই কেবিনেও ঘড়ি নেই। দুঘণ্টা আমি চুপচাপ বসে রইলাম। ঘুমের মধ্যে মানুষ নড়াচড়া করে। এপোশ ওপাশ করে। চোখের পাতা কখনো দ্রুত কাঁপে কখনো অল্প কাঁপে। ফরিদার বেলায় সে-রকম কিছুই হলো না। তার নিঃশ্বাসের শব্দ হলো না। চোখের পাতাও কাঁপল না। এক সময় জেগে উঠে বিড়বিড় করে বলল, পানি খাব।

আমি পানি খাওয়ালাম। তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললাম, ঘুম ভালো হয়েছে

ফরিদা বলল, হ্যাঁ।

ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখেছ?

না। আমি কতক্ষণ। ঘুমিয়েছি?

দুঘণ্টার মতো।

ছিঃ ছিঃ— আপনি দুঘণ্টা বসেছিলেন! আমার খুবই লজ্জা লাগছে। চলে গেলেন না কেন?

তুমি বসে থাকতে বলেছ।

থ্যাংক য়্যু। আমি যে এতক্ষণ। ঘুমিয়েছি নিজেই বুঝতে পারি নি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল–চোখ বন্ধ করেই জেগে উঠেছি। মৃত্যু কাছাকাছি চলে এলে সময়ের হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার বোধহয়....

ফরিদা কথা শেষ না করে হাসল। আমি বললাম, তুমি আমাকে কিছু গোপন কথা বলার জন্যে বসিয়ে রেখেছিলো। আমার ধারণা কথাগুলি তুমি এখন বলতে চাও না।

আপনার ধারণা ঠিকই আছে।

আমি কি এখন চলে যাব?

হ্যাঁ, চলে যান।

অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে ছিলাম, তুমি কিন্তু একবারও জানতে চাও নি। ইমরুল

কেমন আছে।

ফরিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ইমরুল কেমন আছে?

আমি বললাম, ভালো।

ফরিদা বলল, আপনার সঙ্গে আমার আর মনে হয় দেখা হবে না।

আমি বললাম, আমারও মনে হয় দেখা হবে না।

ফরিদা বলল, আপনাকে নিয়ে আমি খুবই হাসির একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নের কথা এখন আর আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে না। তবে আমি একটা কাজ করব।— লিখে ফেলব। তারপর লেখাটা আপনাকে পাঠাব। হিমুভাই, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে। আমি চেষ্টা করলে গল্প-উপন্যাস লিখতে পারব। বিছানায় শুয়ে মজার মজার সব

গল্প আমার মাথায় আসে।

লিখে ফেললেই পোর।

লজা লাগে বলে লিখতে পারি না।

লজা লাগে কেন?

বুঝতে পারছি না কেন। আচ্ছা ঠিক আছে, লজ্জা লাগুক বাঁ না লাগুক আমি একটা গল্প লিখে ফেলব।

৭. বিস্ময়কর ঘটনা শেষপর্যন্ত ঘটেছে

বিস্ময়কর ঘটনা শেষপর্যন্ত ঘটেছে। খালু সাহেবকে নিয়ে আমি মহিলা পীরের উদ্দেশে রওনা হয়েছি। মাজেদা খালা সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। খালু সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন। ধমক দিলেন বাক্যটা ঠিক হলো না। তিনি ধমক দেয়ার মতো মুখে বিকট ভঙ্গি করলেন, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না। এতেই মাজেদা খালা ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, ঝামেলা তুই নিয়ে যা।

যাত্রাপথ দীর্ঘ। প্রথমে আমরা খালু সাহেবের গাড়িতে করে বাদামতলী ঘাট পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে বুড়িগঙ্গা পার হবার জন্যে নৌকা নিলাম। নৌকায় উঠে তিনি আমার দিকে সুচ-চোখে তাকিয়ে রইলেন। যে চোখের সৃষ্টি সুচের মতো বিধে সেটাই সুচ-চোখ। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে আমার শরীরের নানান জায়গায় ফুটা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে পকেট থেকে ডায়েরি বের করে লিখলেন—আর কত দূর? আমি কিছু বললাম না; মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। মধুর ভঙ্গির হাসি সব সময় সুখকর নয়। খালু সাহেবকে দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। যতবারই হাসছি ততবারই উনি চিড়বিড়য়ে উঠছেন। নৌকায় আছেন বলে উল্টে দিকে হাঁটা দিতে পারছেন না। তার মনের যে অবস্থা এতে তিনি যে আমাকে ফেলে হাঁটা দিতেন এটা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার মাঝামাঝি এসে তিনি ডায়েরি বের করে লিখলেন—আমি কোথাও যাব না। নৌকা ঘুরাতে বলো। আমি আবারো আগের মতো হাসলাম। তবে এই হাসির প্যাটার্ন একটু অন্যরকম। দুষ্ট শিশুর অন্যায় আবদার শুনে মুরুব্বিরা যে হাসি হাসেন আমি হাসলাম সেই হাসি। খালু সাহেব চিড়বিড়িয়ে উঠলেন।

নৌকা থেকে নেমে আমরা একটা টেম্পো নিলাম। টেম্পো থেকে নেমে গরুর গাড়ি। দিনের আলো তখনো আছে। তবে দ্রুত কমে আসছে। খালু সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি এরকম যে যে-কোনো মুহূর্তে তিনি গরুর গাড়ি থেকে নেমে পড়বেন। তিনি আবারো পকেট থেকে ডায়েরি বের করে লিখলেন—আর কতদূর? আমি আগের চেয়েও মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। মধুরতম হাসি খালু সাহেবের গায়ে মনে হলো পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে ধরিয়ে দিল।

আমি বললাম, খালু সাহেব এত অস্থির হচ্ছেন কেন? দৃশ্য দেখুন। কী সুন্দর দৃশ্য! বাংলার গ্রাম। পল্লীবধু কলসি কাখে নদীতে পানি আনতে যাচ্ছে। গরু অলস ভঙ্গিতে শুয়ে শুয়ে জাাবের কাটছে। আকাশে দিনের শেষের কন্যা সুন্দর আলো ঝলমল করছে। ঐ কবিতাটা কি আপনার মনে আছে খালু সাহেব? তুমি যাবে ভাই–যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায়?

খালু সাহেব ঘোৎ করে এমন এক শব্দ করলেন যে গরুর গাড়ির গারোয়ান চমকে উঠে বলল, উনার ঘটনা কী?

ঘটনা ব্যাখ্যা করলাম না, তবে আমি চুপ করে গেলাম। খালু সাহেবকে আর ঘটানো ঠিক হবে না। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

আমরা গরুর গাড়ি থেকে নোমলাম সন্ধ্যা মিলাবার পর। এখন হাটপথ। ক্ষেতের আল বেয়ে হাঁটা। খালু সাহেবের ইটালিয়ান জুতা কান্দাপানিতে মাখামাখি হয়ে গেল। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল বিল পার হওয়ার সময়। খালু সাহেবের বাঁ পা হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডেবে গেল। পা সহজেই টেনে তোলা গেল। কিন্তু সেই পায়ের জুতা কাদার ভেতর থেকে গেল।

আমি শান্ত গলায় খালু সাহেবকে বললাম, এক পায়ের জুতা কি থাকবে? না-কি এটা ফেলে আমার মতো খালি পায়ে যাবেন? খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে কিছু নিশ্চয়ই বললেন। ভাগ্যিস তার জবান বন্ধ— কী বললেন শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলে অবশ্যই ভালো লাগত না।

পীর মামার বাড়িতে আমরা পৌঁছলাম রাত আটটার দিকে। পীর মামা তখন মাত্র এশার নামাজ আদায় করে হুজরাখানায় বসেছেন। নানান বয়সের নারীপুরুষ তাকে ঘিরে বসে আছে। মামা কল্কেতে টান দিচ্ছেন। এই দৃশ্য ভক্তরা অতি ভক্তির সঙ্গে দেখছে। পীর-ফকিররা গাঁজা খেলে দোষ হয় না। সাধারণ মানুষরা খেলে দোষ হয়।

পীর মামা আমাকে দেখে কল্কে নামালেন। টকটকে লাল চোখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে অতি মিষ্ট গলায় বললেন, কেমন আছিস রে হিমু?

মামার শরীর মাঝারি সাইজের হাতির মতো। কিন্তু গলার স্বর অতি মধুর। আমি বিনীত গলায় বললাম, ভালো আছি।

রোগী নিয়ে এসেছিস?

জি।

তোর জানি কী হয়?

খালু হয়। এর দেখি আদব লেহাজ কিছুই নাই। আমারে সেলামালকি দিল না। কদমবুসিও করল না।

মামা মাফ করে দেন। রোগীমানুষ।

জবান বন্ধ?

জি।

মামা আবারো কল্কে হাতে নিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে দার্শনিকের মতো গলায় বললেন, জবান বন্ধ থাকাই ভালো। জগতের বেশিরভাগ পাপ কাজ জবানের কারণে হয়।

আমি বললাম, মামা, আশা নিয়ে শহর থেকে এসেছি, জবান ঠিক করে দেন।

মামা বললেন, আমি জবান ঠিক করার মালিক না। জবান ঠিক করার মালিক আল্লাহপাক। যাই হোক, এসেছিস যখন চেষ্টা করে দেখি। ওরে তোরা রোগীরে শক্ত করে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেল। হাত-পা যেন নাড়াইতে না পারে।

উনার কথা শেষ হবার আগেই মামার লোকজন অতিদ্রুত খালু সাহেবের হাত-পা বেঁধে খুঁটির সঙ্গে লটকে দিল। উনি ভয়ে চুপসে গেলেন। তেমন কোনো বাঁধা দিলেন। না। এ ধরনের কোনো ঘটনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। খালু সাহেব এতই ঘাবড়ে গেছেন যে আমার দিকেও তাকাচ্ছেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে পীর মামার দিকে তাকিয়ে আছেন।

পীর মামা বললেন, এখন এক কাজ করা–পাটকাঠির মাথায় কাচা গু মাখিয়ে আন। এনে এই জবান বন্ধ লোকের মুখে চুকিয়ে দে। ইনশাল্লাহ জবান ফুটবে।

এক লোক দৌড়ে গেল পাটকাঠিতে গু মাখিয়ে আনতে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে আনন্দের নাড়াচাড়া দেখা গেল। খালু সাহেবের চোখ দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে অক্ষিকোটির থেকে চোখ বের হয়ে আসবে। চারদিকে চরম উত্তেজনা।

পীর মামা হাত উঁচু করে উত্তেজনা কিছুটা কমালেন। মিষ্টি গলায় বললেন, গু খাওয়ানোর আগে এর মাথাটা কামায়ে দে। মাথা কামানো কোনো চিকিৎসা না। আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছে বলে শাস্তি। আমারে সেলামালকি দেয় নাই।

মামার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। ওয়ান টাইম রেজারে মাথা মুণ্ডিত হলো। খালু সাহেবকে এখন দেখাচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো। চেহারার মধ্যে কেমন যেন মায়া মায়া ভাব চলে এসেছে।

পীর মামা খালু সাহেবের দিকে তাকিয়ে অতি মধুর গলায় বললেন–বাবা গো, এখন একটু গু খাও। বেশি খাইতে হবে না। পাটকাঠির মধ্যে যতটুকু আনছে ততটুকু খাইলেই কাজ হবে। মুখ বন্ধ কইরা রাখবা না। কেমন? মামার কথা শোন।

গু-মাখানো পাটকাঠি এসেছে। মামার মতোই অত্যন্ত বলশালী এক লোক সেই পাটকাঠি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সেই কাঠি মুখের ভেতর ঢুকাতে হলো না। তার আগেই খালু সাহেব স্পষ্ট গলায় বললেন, খাব না, আমি গু খাব না।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

চারদিকে আনন্দের হুল্লোড় উঠল। ফুটেছে, জবান ফুটেছে। আল্লাহু আকবর। আল্লাহু অ্যাকবর।

আমি খালু সাহেবকে নিয়ে ফিরছি। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় উঠা পর্যন্ত তিনি কোনো কথা বললেন না। আমার ধারণা হলো আবারো বোধহয় জবান বন্ধ হয়ে গেছে। নৌকায় উঠার পর তিনি কথা বললেন। শান্ত গলায় বললেন, হিমু, তুমি কি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবো?

আমি বললাম, জি খালু সাহেব বলব।

খালু সাহেব বললেন, আমার ধারণা— যে চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে পীর মামা আমাকে আরোগ্য করলেন, সেই চিকিৎসাপদ্ধতি উনার মাথায় আসে নি। তুমি তাকে শিখিয়ে দিয়েছ। আমি ঠিক ধরেছি না?

জি, ঠিক ধরেছেন।

হিমু শোন, আমার বাড়িতে একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে। তোমাকে আর যদি কোনোদিন আমার বাড়িতে দেখি পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলব। আমার ফাঁসি হোক যাবজীবন হোক কিছু যায় আসে না। মনে থাকবে হিমু?

জি, মনে থাকব।

আমি কথা বলতে পারছি— I am happy about that. Thank you. কিন্তু আমার বাড়িতে তোমাকে দেখলে অবশ্যই আমি তোমাকে গুলি করব। বুড়িগঙ্গার উপরে তোমার সঙ্গে দেখাই যেন আমাদের শেষ দেখা হয়।

জি, আচ্ছা।

খালু সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাতের বুড়িগঙ্গার শোভা দেখতে লাগলেন। রাতের বুড়িগঙ্গা সত্যিই অপূর্ব।

হিমু।

জি।

ধর আমি যদি কথা না বলতাম তাহলে ঐ বদ মেয়ে কি আমার মুখে গুয়ের কাঠিটা দিয়ে দিত?

মনে হয় দিত।

শেষ মুহুর্তে তুমি আটকাতে না?

ইচ্ছা থাকলেও আটকানো যেত না। মব সাইকলজি কাজ করছিল। যেখানে মব সাইকোলজি কাজ করে সেখানে চুপ করে থাকতে হয়।

হিমু!

জি।

যে চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে আমি আরোগ্য লাভ করেছি। আশা করি এই চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে তুমি কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

আমি বলব না।

হিমু।

জি।

তোমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না।

খালু সাহেব, আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে না। ক্ষমা করলেই আমি লাই পেয়ে যাব। আরো বড় কোনো অপরাধ করে ফেলব।

কথা ভুল বলো নি। আচ্ছা হিমু শোন— আমার গলার স্বর কি আগের মতোই আছে?

সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। আপনার গলার স্বর আগের চেয়ে মধুর হয়েছে।

খালু সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, আমার নিজেরও তাই ধারণা।

তিনি নৌকার গলুইয়ে বসে আছেন। নদীর ঘোলা পানির দিকে তাকিয়ে হয়তো পানিতে নিজের ছায়া দেখছেন। মানুষ চলমান জলে নিজের ছবি দেখতে খুব পছন্দ করে।

৮. ফরিদার চিঠি

ফরিদার চিঠি পেয়েছি। মেয়েদের অনেক গুণের মধ্যে বড় গুণ হলো এরা খুব সুন্দর করে চিঠি লিখতে পারে। কথাবার্তায় নিতান্ত এলোমেলো মেয়েও চিঠি লেখায় গোছানো। মেয়েদের চিঠিতে আরেকটি ব্যাপার থাকে–বিষাদময়তা। নিতান্ত আনন্দসংবাদ দিয়ে লেখা চিঠির মধ্যেও তারা কী করে জানি সামান্য হলেও দুঃখ মিশিয়ে দেয়। কাজটা তারা যে ইচ্ছা করে করে তা-না। প্রকৃতিতাদের চরিত্রে যে বিষাদময়তা দিয়ে রেখেছে তাই হয়তো চিঠিতে উঠে আসে।

ফরিদা লিখেছে— হিমুভাই,

আজ একটু আগে আপনি হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন। দীর্ঘসময় আপনি আমার বিছানার পাশে চুপচাপ বসে ছিলেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। জেগে। উঠে সে জন্যেই খুব লজ্জা পেয়েছি। আপনি আমার কাছের কেউ নন। খুব কাছের কেউ আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে এটা ভাবতেই আমার অস্বস্তি লাগে। আপনি তাকিয়ে ছিলেন ভেবে সে কারণেই খুব সঙ্কুচিত বোধ করছি। হিমুভাই, আপনি রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি আমার পাশেই বসে ছিলেন তারপরও আমার দিকে একবারও তাকান নি। আপনি সবসময়ই পর্দার আড়ালের একজন। আমি আপনাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। বুঝতে পারি নি। জটিল মানুষ খুব সহজেই বোঝা যায়। আপনি জটিল না, আবার আপনি খুবই সরল সাদাসিধা মানুষ তাই বাঁ বলি কী করে?

আপনার কথা থাক। নিজের কথা বলি। এই কথাটা না বললেও কিছু যেত আসত না। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হচ্ছে পৃথিবীর একটি মানুষও কি আমার ভেতরের সত্যটা জানবে না! সেই সত্য যত নির্মমই হোক তারপরও তো সত্য। অন্তত একজন মানুষ আমার সত্যি পরিচয় জানুক। সেই একজন আপনি হওয়াই সবচে নিরাপদ।

হিমুভাই, আমি আমার মোটামুটি দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ইমরুলের বাবাকে ভালোবাসতে পারি নি। পাশাপাশি বাস (এক বিছানায়) করলে যে মমতা তৈরি হয় তা হয়েছে। সেই মমতাও খুব বেশি কিন্তু না।

না, আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নি। সবার কাছে আমাদের পরিচয় আদর্শ দম্পতি। আপনার বন্ধু ধরেই নিয়েছিল—তার প্রতি ভালোবাসায় আমার হৃদয় টলমল করছে। সে হয়তো ভেবেছে, যে বন্ধু তার স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ দশ বছরে একটি বারও উঁচু গলায় কথা বলে নি, কঠিন করে তাকায় নি। সেই তরুণী বধুর হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ। বোকা মানুষটা বুঝতেও পারে। নি ব্যাপারটা কী। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে–জীবন তো চলেই যাচ্ছে। কোথাও থমকে যাচ্ছে না। যখন অসুখটা হলো–আমি বুঝে গোলাম সময় চলে এসেছে, তখন হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হলো। মনে হলো— কিছু না পেয়েই চলে যাচ্ছি?

তারপর একটা ঘটনা ঘটল। বিশেষ ঘটনা। কিশোৰী বয়সে যে মানুষটাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছিলাম সে হঠাৎ উদয় হলো তখন। তাকে দেখে কী যে ভালো লাগল। ইচ্ছা করল চিৎকার করে আনন্দে কেঁদে উঠি। হিমুভাই, আপনি শুনলে খুবই অবাক হবেন, হয়তো বাঁ খানিকটা কষ্টও পাবেন, মানুষটাকে দেখে আমার মনে হলো–ইস, সে যদি

আমাকে নিয়ে অনেক দূরের কোনো দেশে চলে যেত! যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। যে দেশে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। (এমনকি ইমরুলও নেই।)

আপনার কাছে অকপটে সত্যি কথা বললাম। এখন নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। রাশেদুল করিম নামের মানুষটা মহা ব্যস্ত হয়ে গেছে আমাকে বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে। খুব লোভ হচ্ছে। চিকিৎসা হোক বাঁ না হোক তার সঙ্গে কিছু দিন তো থাকতে পারব! রোজ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলতে পারব। (আমি খুব খারাপ, তাই না হিমুভাই) আমার ভেতর যত লোভই থাকুক। এই কাজ আমি করব না। ভালো না বেসে একধরনের অপমান আমি ইমরুলের বাবাকে করেছি। বেচারা সেটা বুঝতে পারে নি বলে কষ্ট পায় নি। এখন যদি আমি রাশেদের টাকায় চিকিৎসা করি ইমরুলের বাবা কষ্ট পাবে। এই কষ্ট আমি কখনো, কোনোদিনও দিব না। এই সম্মানটুকু আমি তাকে করব।

শুনতে পেয়েছি ইমরুলকে আপনি আসমা হক নামের এক মহিলার কাছে রেখে এসেছেন। এই মহিলা তাকে পালক পুত্র হিসেবে বড় করবে। এইসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ আমি নিশ্চিত জানি–ইমরুলের জন্যে যা ভালো। আপনি তাই করবেন। মানুষ আপনাকে নিয়ে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে কিন্তু আমি জানি মানুষের জন্যে যা শুভ যা কল্যাণকর আপনি সারাজীবন তাই করে এসেছেন।

আমি মাঝে মাঝে এই ভেবে অবাক হই যে পৃথিবীতে আপনার মতো ভালো মানুষ যেমন আসে, আমার মতো খারাপ মানুষও আসে। এইভাবেই পৃথিবীতে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

সূচিপত্র

ফরিদা

ফরিদার চিঠি ভালোমতো বোঝার জন্যে দ্বিতীয়বার পড়া উচিত। পড়া গেল না, কারণ আমার (মহান!)। শিক্ষক বাবা এই বিষয়ে কঠিন নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

বাবা হিমালয়, পৃথিবীর যে-কোনো দৃশ্য প্রথমবার দেখিবে। একবার দৃষ্টি ফিরাইবার পর দ্বিতীয়বার তাকাইবে না। তাহাতে মায়া তৈরি হইবে। মায়া তৈরি হওয়ার অর্থই বিভ্রম ও ভ্রান্তি তৈরি হওয়া। ভ্রান্তি উদয় হওয়ার অর্থই হইল ভ্রান্তি বিলাস তৈরি হওয়া। বিলাসের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেই। মনে কর তুমি একজন প্রবাসী। তোমার অতি নিকট একজন তোমাকে একটি পত্র দিয়াছেন। পত্রটি দীর্ঘ, কিন্তু কিছুটা জটিল। পাঠোদ্ধারের জন্য তোমাকে পত্রটি দ্বিতীয়বার পড়িতে হইবে। ভুলেও এই কাজ করিবে না। লাভের মধ্যে লাভ হইবে তুমি মায়ায় জড়াইবে। পত্র তা সে যত মূল্যবানই হোক পাঠ সমাপ্ত মাত্র কুচি কুচি করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিবে। চেষ্টা করিবে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে।

আমি বাবার উপদেশমতো ফরিদার চিঠি কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম। দক্ষিণের মৌসুমী বায়ুর কারণে চিঠির কুচিগুলো কিছুক্ষণ হাওয়ায় উড়ল। যে-কোনো উড়ন্ত জিনিসই দেখতে ভালো লাগে। আমার মনে কিছুক্ষণের জন্যে ভালো লাগার বোধ তৈরি হলো। ভালো লাগার বোধ তৈরি হলেই ভালো মানুষদের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা! করে। মাজেদা খালার বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। যোগাযোগের মাধ্যম টেলিফোন। ঠিক করলাম খালু সাহেব টেলিফোন ধরলেই গলা মোটা করে বলব— আচ্ছা এটা কি মাোহাম্মদপুর দমকল বাহিনী? এই মুহূর্তে আমার একটা দমকল দরকার।

টেলিফোন ধরলেন খালা। আমি কিছু বলার আগেই খালা বললেন, হিমু না কি?

আমি বললাম, বুঝলে কী করে, আমি তো এখনো হ্যালো বলি নি।

খালা বললেন, খুব প্রিয় কেউ টেলিফোন করলে বোঝা যায়। টেলিফোনের রিং

অন্যরকম করে বাজে।

খালু সাহেব কেমন আছেন?

ভালো।

কথা বলে যাচ্ছেন তো?

সারাক্ষণই কথা বলছে। বিরক্ত করে মারছে। অনেকদিন কথা বলতে পারে নি, এখন পুষিয়ে নিচ্ছে।

মাথায় চুল উঠেছে?

উঠেছিল। নাপিত ডাকিয়ে আবার পুরো মাথা কামিয়েছে।

কেন?

জানি না কেন। তবে সে সুখে আছে।

খালা আনন্দের হাসি হাসলেন। আমি বললাম, অসুখ সেরে যাওয়ায় খালু সাহেব নিশ্চয়ই খুশি।

খুশি তো বটেই। তোর উপর কেন জানি খুবই নারাজ। আমি তোর খালুকে বললাম, বেচারা হিমু এত কষ্ট করে চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে ভালো করেছে। তুমি কেন তার উপর নারাজ?

তার উত্তরে খালু সাহেব কী বলেছেন?

সে চিৎকার করে বলেছে–শাটতাপ। তোর নামই সে শুনতে পারে না। নাম শুনলেই চিৎকার চোঁচামেচি করে। আচ্ছা হিমু, ঐ মহিলা পীর কী চিকিৎসা করেছিলেন বল তো?

শুনে কী করবে? বাদ দাও। চিকিৎসায় ফল হয়েছে–এটাই আসল কথা।

অবশ্যই।

মনে করা যাক চিকিৎসা হিসেবে সে গু খাইয়ে দিয়েছে। তখন ধরতে হবে গু হলো কোরামিন ইনজেকশন। ঠিক না খালা?

অবশ্যই ঠিক।

খালা, কথা শেষ, টেলিফোন রাখি।

খালা টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন, না না খবরদার। আমি আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার কী হয়েছে কে জানে, দুনিয়ার কথা টেলিফোনে বলি, আসল কথা বলতে ভুলে যাই।

আসল কথাটা তাড়াতাড়ি বলো। নয়তো আবার ভুলে যাবে।

আসমা তোকে খুঁজছে। পাগলের মতো খুঁজছে।

উনি যখন খোঁজেন পাগলের মতো খোঁজেন। এটা নতুন কিছু না।

এইবার সত্যি সত্যি পাগলের মতো খুঁজছে। আমার মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে।

৯. আমি সূর্যাস্ত দেখছি

আমার বিছানার পাশে কে যেন বসে আছে। সূর্যের আলো ভালোমতো ফোটে নি। যে বসে আছে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তারপরেও চেনা চেনা লাগছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই লোকটাকে চিনে ফেলব। আমি তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মনে হলো এত কষ্ট করে চেনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর পাতলা চাদর থাকায় আরামদায়ক ওম। চেনাচেনি বাদ দিয়ে আরো খানিকক্ষণ ঘুমানো যেতে পারে। বিছানার পাশে যে বসে আছে বসে থাকুক। ঘুম ভাঙার পর দিনের প্রথম আলোয় তার সঙ্গে পরিচয় হবে। দিনের প্রথম আলোয় বিভ্রম থাকে না। পরিচয়ের জন্যে বিভ্রমহীন আলোর কোনো বিকল্প নেই।

আমি চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিলাম। আমার মাথার ভেতর জটিল গবেষণামূলক আলোচনা আসি আসি করছে। তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আরাম করে কিছুক্ষণ ঘুমানো দরকার। পৃথিবীতে সবচে সুখী মানুষ কে? যার কাছে ঘুম আনন্দময় সে-ই পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষ। কথাটা কে বলেছেন? বিখ্যাত কেউ নিশ্চয়ই বলেছেন। সাধারণ মানুষ যত ভালো কথাই বলুক কেউ তা বিবেচনার ভেতরও আনবে না। কথাটা বলতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজনকে।

পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষের মতো আমি ঘুমালাম। ঘুম ভাঙার পরেও বিছানায় উঠে বসলাম না। ছোটবেলার মতো চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে রইলাম। আমার বিছানার পাশে বসে থাকা লোকটা এখনো আছে। তাকে এখনো চিনতে পারছি না। তবে চিনে ফেলব। সমস্যা হচ্ছে তাকে চিনতে ইচ্ছা! হচ্ছে না।

হিমু সাহেব!

জি।

মনে হচ্ছে আপনার ঘুম ভেঙেছে। আমি ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এসেছি। মুখ না ধুয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস কি আপনার আছে?

আছে।

এক কাপ চা কি দেব?

দিতে পারেন।

আমাকে কি আপনি চিনতে পেরেছেন?

না।

আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিজেই আমাকে চিনতে পারছি না। আয়নার দিকে তাকিয়ে আতকে উঠে ভেবেছি–এ কে? গত রাতে আমি গোঁফ ফেলে দিয়েছি। এতেই চেহারাটা অনেকখানি পাল্টে গেছে। তার উপর গায়ে দিয়েছি কটকট হলুদ পাঞ্জাবি। কড়া হলুদ রঙ যে আইডেনটিটি ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে তা জানতাম না।

ভদ্রলোক শরীর দুলিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। হাসি থামার পরেও আমার খাট দুলতে লাগল।

আমি চোখ মেলে। ভদ্রলোককে দেখলাম। বিছানায় উঠে বসলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে গরম চা ভর্তি মগ ধরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি কে?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার আসমা ম্যাডামের হাজবেন্ড। নাম ফজলুল আলম।

আপনি এখানে কেন?

আমি ঠিক করেছি আজ। সারাদিন আমি আপনার সঙ্গে থাকব। এই উপলক্ষে একটা হলুদ পাঞ্জাবি বানিয়েছি। আমি এসেছিও খালি পায়ে।

আমি কিছু বললাম না। চায়ে চুমুক দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, চাটা কি ভালো হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমি কি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকতে পারি?

থাকতে চাচ্ছেন কেন?

আপনি সারাদিনে কী কী করেন সেটা দেখার ইচ্ছা।

আমি সারাদিনে কিছুই করি না।

আমি এই কিছুই করি না-টাই দেখব। ভালো কথা, আমি ইমরুল ছেলেটির মায়ের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করেছি। এই মহিলাকে তার স্বামী এবং সন্তানসহ দেশের বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি।

আমি কিছু না বলে আমার চায়ের মগ বাড়িয়ে দিলাম। চা খেতে খুবই ভালো হয়েছে। এই চা দুতিন মগ খাওয়া যায়।

ভদ্রলোকের ধৈর্য ভালো। আমি তাঁকে নিয়ে সারাদিন হোটলাম। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা । তিনি একবারও বললেন না, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মতিঝিল এলাকায় একুশতলা বিল্ডিং-এর ফাউন্ডেশন হচ্ছে। আমি ভদ্রলোককে নিয়ে ঘণ্টাখানেক মাটি খোড়া দেখলাম। সেখান থেকে গেলাম নাটকপাড়া বেইলী রোডে। সেখানে একটা ফুচকার দোকানে রুপবতী সব মেয়েরা নানান ধরনের আহ্বাদ করতে করতে ফুচকা খায়। দেখতে ভালো লাগে।

ফুচকা খাওয়া দেখে গেলাম রমনা থানায়। এই থানার বারান্দায় কেরোসিনের চুলা পেতে ইদ্রিস নামের এক ছেলে চা বানায়। তার চা হলো অসাধারণ টু দা পাওয়ার টেন। আসমা ম্যাডামের হাজবেন্ডকে এই চা খাইয়ে দেয়া দরকার। থানার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, হিমু না?

আমি বললাম, জি।

আপনাকে আমি বলেছি থানার ত্রিসীমানায় যদি আপনাকে দেখি তাহলে খবর আছে। আমি আপনাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেব।

চা খেতে এসেছি। স্যার। ইদ্রিসের চা। চা খেয়েই চলে যাব। প্রমিস।

থানার ভেতর চা খাওয়া যাবে না। এটা কোনো রেস্টুরেন্ট না। কাপ হাতে নিয়ে রাস্তায় চলে যান। এক্ষুণি। এক্ষুণি।

আমরা কাপ হাতে রাস্তায় চলে গেলাম। চা শেষ করে গেলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই সময় সেখানে নানান ধরনের মানুষের সমাগম হয়। ওদের দেখতে ভালো লাগে। পার্কের একটি অংশে আসে হিজড়ারা। তারা আসে পুরুষের বেশে। এখানে এসে নিজেদের নারী করার চেষ্টা করে। ঠোঁটে কিড়া করে লিপষ্টিক দেয়। নারিকেলের মালার কাচুলি পরে। মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব এনে একজন আরেকজনের চোখে কাজল দিয়ে। দেয়। এদের সবার সঙ্গেই আমার খুব খাতির। আমাদের দুজনকে দেখে তারা খুশি হলো।

একজন আনন্দিত গলায় বলল, কেমন আছেন গো হিমু ভাইজান?

ভালো আছি।

সাথে কে?

জানি না। আমার সাথে কে? আমি নিজেকেই চিনি না। অন্যকে চিনব কীভাবে?

আমার কথায় তাদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল। তারা খুবই মজা পেল।

সন্ধ্যার আগে আগে আমি ফজলুল আলম সাহেবকে নিয়ে গেলাম বুড়িগঙ্গায় চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে। রোজ সন্ধ্যায়। সেখানে একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হন। তার উদ্দেশ্য সেতু থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়বেন। আত্মহত্যা করবেন। শেষপর্যন্ত সাহসের অভাবে কাজটা করতে পারেন না। বাড়িতে ফিরে যান। পরদিন আবার আসেন। ইনার সঙ্গে কথা বললে ফজলুল আলম সাহেবের মজা পাওয়ার কথা। চারদিকে এতসব মজার উপকরণ ছড়ানো।

পাওয়া গেল না। হয় তিনি আত্মহত্যা করে ফেলেছেন কিংবা আত্মহত্যার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন। এখন এই সময়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের গরম সিঙ্গাড়া দিয়ে চা খাচ্ছেন।

হিমু সাহেব!

জি।

দিন তো শেষ হয়ে এলো। আপনি আমার এবং আমার স্ত্রীর জন্যে যা করেছেন। তার জন্যে Thank You–এই ইংরেজি বাক্যটা বলতে চাই। কখন বললে ভালো হয়?

সবচে ভালো হয় সূর্য ডোবার সময় বললে।

তিনি সূর্য ডোবার বিশেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি অপেক্ষা করছি...। থাক বলব না কিসের অপেক্ষা করছি। ভর সন্ধ্যায় যখন চারদিকে হাহাকার ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে তখন ব্যক্তিগত অপেক্ষার কথা বলতে হয় না।

হিমু সাহেব!

জি।

থ্যাংক য়্যু বাক্যটা ঠিকমতো বলতে পারছি না। কথাগুলি গলায় আটকে যাচ্ছে।

আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আসুন চুপচাপ সূর্যাস্ত দেখি।

আমি সূর্যাস্ত দেখছি। ফজলুল আলম সাহেব দেখছেন না। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছেন। তারপরেও চোখের পানি আটকাতে পারছেন না। সূর্য ডোবার মাহেন্দ্রক্ষণে একবার কান্না পেয়ে গেলে সেই কান্না থামানো খুব কঠিন।

(সমাপ্ত)